কল্যাণ

রামকৃষ্ণ মিশন
ব্রহ্মানন্দ কলেজ অব্ এডুকেশন

কল্যাণ

রামকৃষ্ণ মিশন
ব্রহ্মানন্দ কলেজ অব্ এডুকেশন

রহড়া, কলকাতা - ৭০০ ১১৮

প্রকাশন সংখ্যা ঃ ৬০ **শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০২৩**

প্রধান উপদেষ্টা
অধ্যক্ষ, স্বামী নিরীশানন্দ

পত্রিকা সম্পাদক
অধ্যাপক, ড. কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

পত্রিকা উপসমিতির শিক্ষক সদস্য ঃ—
অধ্যাপক, ড. মলয়েন্দু দিন্দা
অধ্যাপক, ড. সঞ্জয় মিত্র

শিক্ষার্থী সদস্য ঃ—
শ্রী কৌস্তভ ঘোষ
সেকেন্দার সেখ

প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
প্রকাশক ঃ স্বামী জয়ানন্দ
সচিব, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ স্বামী নিরীশানন্দ (অধ্যক্ষ)
মুদ্রণ ঃ রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
দূরভাষ ঃ ২৫৬৮-২৮৫০, ৩২১৯

কার্য নির্বাহক উপসমিতি ঃ ২০২৩

সভাপতি ঃ স্বামী নিরীশানন্দ, অধ্যক্ষ
শিক্ষক-সংসদ সম্পাদক ঃ ড. সুব্রত বিশ্বাস

—ঃ উপসমিতির আহ্বায়কবৃন্দ ঃ—

সাংস্কৃতিক কার্যাবলি ঃ ড. কৌশিক চট্টোপাধ্যায়
ভর্তি পরীক্ষা, সময় নির্ঘণ্ট ও রেকর্ড ঃ ড. সঞ্জয় মিত্র,
শ্রী শুভজিৎ চক্রবর্তী

—ঃ ছাত্রাবাস সমিতি ঃ—

অধ্যক্ষ ঃ চেয়ারম্যান
সদস্য ঃ ছাত্রাবাস সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট,
হোস্টেল প্রিফেক্ট

RAMAKRISHNA MISSION BOYS' HOME
P.O. Rahara, Kolkata - 700 118 (West Bengal), INDIA
Phone : [STD – 033] 2568-2850 & 3219, Secy.–2523-6116 & 7666 [d]
[A Branch Centre of Ramakrishna Mission, Belur Math, Howrah-711202]

সেপ্টেম্বর, ২০২৩

শুভেচ্ছা

উজ্জ্বল ঐতিহ্যের ধারায় প্রকাশিত হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন ব্রহ্মানন্দ কলেজ অব্ এডুকেশনের মনন চর্চার বার্ষিক পত্রিকা কল্যাণ-এর ৬০তম সংখ্যা।

আজ মানুষ গড়ার শিক্ষা বড্ড প্রাসঙ্গিক, আদর্শ শিক্ষকই আশা-ভরসার স্থল এবং দৃঢ়তার প্রতীক। শিক্ষকদের সৃজনী ভাবনার প্রবাহ সমাজকে সার্থকতা দিতে পারে। 'কল্যাণ' তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। সার্থক হোক এর প্রকাশ। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা জানাই।

সম্পাদক

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
পত্রিকা সম্পাদকের কলমে	ড. কৌশিক চট্টোপাধ্যায় (অধ্যাপক)	৬
যুবসমাজের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা	সৌরভ সামন্ত (ছাত্র)	৭
অঙ্গীকার (কবিতা)	রাজু হালদার (ছাত্র)	৯
রামপ্রসাদ সেন ও উত্তর সাধক	কৌস্তভ ঘোষ (ছাত্র)	১০
বিস্মৃতির অন্তরালে ঢাকেশ্বরী মাতা	আকাশ নীল বিশ্বাস (ছাত্র)	১৫
কেন শুনবো গান	ড. মানস কুমার মৌলিক (অধ্যাপক)	১৯
বন্যার তাড়নায় ঘাটালের স্বর্ণ-শিল্পের উত্থান	সুব্রত জেলে (ছাত্র)	২২
আদিবাসীদের পূজাপার্বণ	প্রসেনজিৎ সরকার (ছাত্র)	২৫
সোহরায় পরব	শ্যাম হেমরম (ছাত্র)	২৭
মুখ (কবিতা)	জ্যোতির্ময় মাইতি (ছাত্র)	২৯
ঐতিহ্যের চন্দননগর	অর্ণব বসাক (ছাত্র)	৩০
সুখ ও দুঃখের প্রকৃতি (কবিতা)	রিজু চ্যাটার্জী (ছাত্র)	৩৮
যুগ যুগ ধরে মানবের সেবায় নিয়োজিত — ভেষজ উদ্ভিদ	সৌরভ হালদার (ছাত্র)	৩৯
সাধুচরণ	নির্মল সাধুখাঁ (ছাত্র)	৪২
অভিশপ্ত লালদীঘি	নাগর মাঝি (ছাত্র)	৫১
গল্প হলেও সত্যি	সৌরভ সরকার (ছাত্র)	৫২
দাম্পত্য	দীপজ্যোতি দে (ছাত্র)	৫৪
সম্ভাবনা	সঞ্জয় বেরা (ছাত্র)	৫৭
দেহ দান..... (কবিতা)	রাহুল দাস (ছাত্র)	৫৮
ভাইজ্যাগ ভ্রমণের আড়াই দিন	অভিম মণ্ডল (ছাত্র)	৫৯
লক ডাউন-এর ভ্রমণকথা	সৌরভ ঘোষ হাজরা (ছাত্র)	৬৩
গঙ্গোত্রীর পথে	রাহুল দাস (ছাত্র)	৬৯

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
অবকাশ (কবিতা)	বিশাল বিশ্বাস (ছাত্র)	৭০
ডুয়ার্স ভ্রমণ	দীপঙ্কর বর্মন (ছাত্র)	৭১
শিক্ষামূলক ভ্রমণ ২০২৩ 'বকখালি'	সুব্রত জেলে (ছাত্র)	৭৩
Swami Vivekananda on Education	Swami Nirishanandal [Principal(Actg.)]	78
Powerful Writing Tools for Aspiring Teachers : Master your Writing Skills	Abdus Safi [Assistant Professor]	82
On Coming of the Universal Mother	Subhasis Roy (Student)	85
Swami Vivekananda's message, still relevant and the eternal source of inspiration for Youth	Debabrata Das [Guest Lecturer]	86
The Sacrifice	Chayan Singha Roy (Student)	89
School Can be Fun (Poetry)	Partha Bhattacharyya (Student)	93
The Last Leaf by O. Henry	Chayan Singha Roy (Student)	94
Educational Thoughts and Ideas of Dr. A. P. J. Abdul Kalam	Sakander Sk (Student)	99
Occupational Shifting : Land use and Land cover Change of South 24 Parganas, West Bengal	Biplab Sardar (Student)	108
Bad habits of Youth ruining future of India	Faisal Imam (Student)	111
Present Governing Body of the College		114
Our Faculties		115
List of B.Ed. Students for the Session : 2022-24		116

সম্পাদকীয়

প্রবহমান দিনের গলিঘুঁজি অন্ধকার বেয়ে নিত্য বয়ে চলে সভ্যতার স্রোত। তপ্ত বিশ্বের দৌড়ক্লান্ত মানুষ ক্ষণিকের শান্তি খোঁজে অহরহ। ভোগবাদী জীবন তিষ্ঠোবার সময় দেয় না এতটুকু। প্রবল থেকে আরও প্রবল বিধ্বংসী ঝড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে যেন সাবাই খুঁজে চলেছি আপনজন। আপনত্ব নেই কোথাও। চিৎকার করছি সমস্বরে। কে আছো আমার? উত্তর নেই। দেরি হয়ে গেছে অনেক। কালস্রোতের করাল গ্রাসে সর্বগ্রাসী আলিঙ্গানের অপূর্ব সুর হারিয়েছি কবেই। সমষ্টি জীবন ছিলো একদিন। সমষ্টির জন্য বেদনা ছিল আমাদের। ভালোবাসাও ছিলো। সতর্ক হইনি। মর্ম গ্রহণ করিনি সঙ্গ সুখের। মর্ম বুঝিনি একসঙ্গে বেঁচে থাকার। প্রত্যক্ষ জীবনের উত্তাপ সহজপ্রাপ্য ভেবে নষ্ট করেছি জলের মতো। তারপর টাকা আর ভোগের পথে উন্নতি খুঁজতে গিয়ে একা হয়ে গেছি কোনদিন। একাকীত্বের মধ্যে দুদ্দাড় ভেঙে গেছি গোটা গোটা জ্যান্ত মানুষ। বাইরের চোখে দেখি ঝকঝকে রাস্তা-ঘাট। শপিং-মল। গলিপথ মেঠোপথেও আজ রাজপথের বেশ। রঙ-বেরঙা ঝকঝকে প্রাইভেট গাড়িতে চাপা লোকজনও সংখ্যাতীত। হাতে হাতে বড়ো বড়ো সাইজের মোবাইল ফোন। দামি দামি বাজার করার ব্যাগ হাতে চলমান অত্যাধুনিক মানুষ। চারপাশের আকাশ মুড়ে দিয়েছে বিজ্ঞাপনের বিশালাকার হোর্ডিং। গ্রামের সঙ্গে জুড়েছে শহর। গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সবাই আজ বাজারমুখী। সন্ধ্যার বাজারে ফুচকার স্টলে ভিড়। ওষুধের দোকানে ভিড়। ডাক্তারখানা-হস্পিট্যালে ভিড়। উলটো দিকে রঙিন সজ্জায় নানান কাফের কাঁচ ঘেরা বাহারি প্লেসে অজস্র সুসজ্জিত তরুণ-তরুণীর ভিড়। অসংখ্য খাবারের রেস্তোঁরা। খাবারের গন্ধ। বিরিয়ানির গন্ধ বাতাসে ছড়ায়। হোম ডেলিভারির বাইক ছোটে রাস্তায়। চারদিকে শুধু দুদ্দাড় গতিময় ভিড়। গ্রামের মানুষগুলিও ভিড়ের মাহাত্ম্য বুঝে গেছে আজ। রাজনীতির পুষ্টিকর প্রাপ্য বুঝে নিতে সভা সমিতি মিছিলের ভিড়। রাস্তায় রাস্তায় ছোট বড়ো মাঝারী নেতার পিছু পিছু ভিক্ষাজীবী মানুষের ভিড়। উন্নয়নের বড়ো বড়ো জেসিবি, বুলডোজারের বিশুদ্ধ ভাঙার আওয়াজে চাপা পড়ে যায় এত এত ভিড়ের মাঝেও শুধু সমষ্টি জীবন। আপনত্বের বোধ। প্রত্যক্ষ জীবনের সুর। জমাট বন্ধ জনতার কোলাহলের মাঝে কী বিকট নির্জনের চাপা আর্তনাদ শোনা যায়। হাতে গোণা গুটি কয়েক নিজের মানুষও দুষ্প্রাপ্য মনে হয়। এও এক জীবন। পুরাতন প্রত্যাখ্যাত হয়ে পিছু হটেছে বহুকাল। এখন হাতে একটা ফোনই বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট এই বুঝেছে মানুষ। কাউকে তো প্রয়োজন নেই। টাকা দিয়ে কেনা যায় সব। কে বলেছে আপনত্ব নেই। ফেসবুকে বন্ধু হয়। হোয়াটস অ্যাপে বন্ধু হয়। কত কত সোশ্যাল সাইট। বন্ধুত্ব বরং বেড়েছে অনেক। নারী-পুরুষে সেকালের ভেদাভেদ নেই। এ সব তো ভালো লক্ষ্মণ। ছাড়ুন তো ওসব। ওসব অনাধুনিক। ব্যাকডেটেড। অমন মণিপুর থেকে মালদা নির্যাতিত হোক নারী। হোক মানুষ খুন বহুগুণ। তবু এ তো নতুন দিন। কাকু-কাকীমা, জেঠু-জেঠিমা, দাদু-দিদিমাদের জায়গা খুঁজে লাভ নেই কোথাও। এখন বন্ধু তরুণের জয়। তারুণ্যের জয়। হা হুতাশ করে লাভ নেই। তারপর হঠাৎ হুল্লোড় থেমে এলে যখন হাতের ফোনটা রেখে দেবার পর সম্বিৎ ফেরে তখন ছায়াময় বন্ধু সব যেন নিমেষে উধাও হয়ে যায় কোথাও। বড্ড একা হয়ে যাই আবার। তারুণ্যকে ব্যঙ্গ করছে মহাকাল। চারপাশ বড্ড অন্ধকার। নির্জন। মাথার উপরে প্রেত পিশাচের উন্মত্ত কোলাহল। আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাক দিই, তোমরা সব কোথায়??? কাদের অট্টহাসি প্রতিধ্বনিত হয় শুধু।

প্রতিবারের মতো 'কল্যাণ' এসেছে আবার। বুকে তার একাল-সেকাল। কল্যাণ সাক্ষী থাকে এই প্রজন্ম প্রবাহের। ছাত্রদের লেখাগুলি কখনো কাঁচা মনে হবে কারোর। কিন্তু এর মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে সময়। সময়ের ঘণ্টা ধ্বনি শোনানোর আয়োজন কল্যাণের প্রতি পাতায়। সবাই পড়বেন। পরমার্শ দেবেন। আমাদের ছেলেগুলিকে আশীর্বাদ করবেন। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর কাছে আপনাদের সবার জন্য রইলো কল্যাণের প্রার্থনা।

নমস্কারান্তে,

কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

যুবসমাজের কাছে
স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা

সৌরভ সামন্ত (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

স্বামী বিবেকানন্দ একজন মহান সন্ন্যাসীর সাথে সাথে ছিলেন একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মহান দার্শনিক ও যুবসমাজের কাছে আদর্শ প্রেরণার মহাস্রোত। তাই ১৯৮৪ সাল থেকে প্রতিবছর ১২ই জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনটিকে 'জাতীয় যুব দিবস' [National Youth Day] হিসাবে পালন করা হয়।

স্বামীজী মনে করতেন, সমাজ তথা ভারতের কল্যাণ সাধন-এর জন্যে যুব সমাজের মধ্যে যে সম্ভাবনাগুলি রয়েছে সেগুলির বিকাশ ঘটিয়ে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারলে দেশের চরম উন্নতি সম্ভব। স্বামীজী যুবদের ভিতরে উপস্থিত অসীম শক্তিকে চেনানোর জন্য উৎসাহিত করে বলেন, "বিশ্বের সমস্ত শক্তি তোমার ভেতরে বিরাজমান নিজেকে কখনোই দুর্বল ভেবোনা। ওঠো নিজেকে জাগিয়ে তোলো, তারপর দেখবে সফলতা একদিন তোমার হাতের মধ্যে।" অর্থাৎ তিনি যুবসমাজকে বোঝাতে চেয়েছেন, নিজেকে দুর্বল না ভেবে জীবন যুদ্ধে নিজের সকল শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করে জয়লাভ করতে তথা সফল হতে।

স্বামীজী ছিলেন যুবসমাজের কাছে আদর্শ। তিনি যুবকদের লৌহকঠিন পেশি, ইস্পাত কঠিন চরিত্র ও বজ্রদীপ্ত মনের অধিকারী হয়ে ওঠার কথা বলেন। সকল সামাজিক সংকীর্ণতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে আহ্বান জানান যুবসমাজের প্রতি।

আমরা সবাই জানি, খেয়া যেমন মাঝি ছাড়া চলতে পারে না; অনুরূপভাবে মানুষও লক্ষ্য ছাড়া চলতে পারে না। প্রতিটি মানুষের জীবনে লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। তিনি বলেছেন, যে যা বলে বলুক, আপনি থাকুন নিজের সিদ্ধান্তে এবং লক্ষ্যে, দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নেই। তিনি সদা বোঝাতে চেয়েছেন যে সফল হতে গেলে কাউকে বিশ্বাস কররার দরকার নেই, প্রথমে নিজেকে বিশ্বাস করতে হবে। তিনি সদা সাহসী চিত্তে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে বলেছেন এবং ভয়কে সদা দূরে রাখতে বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি বাণী উল্লেখ করা প্রয়োজন, "কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে ভয় পেয়োনা, এমনকি আকাশ থেকে প্রবল বজ্রাঘাত হলেও ভয় পেয়োনা; উঠে দাঁড়াও, কাজ করো।"

সফলতা পাবার অন্যতম চাবিকাঠি হল, ইতিবাচক চিন্তা ভাবনা। নেতিবাচক ভাবনা কাজের মধ্যে বিষাদ সৃষ্টি করে ও বিফলতা গ্রাস করে। স্বামীজী বলেছেন, "শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতা পাপ। অপরকে ভালোবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করা পাপ। ফলে সুস্থ জীবন বাঁচতে এই রাস্তাই একান্ত

কাম্য।" তিনি এই বাণীর মাধ্যমে শিখিয়েছেন, মানুষকে ভালোবাসতে হবে, মানুষের সেবা করতে হবে, মানুষের পাশে থাকতে হবে। অর্থাৎ তিনি যুবসমাজের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব গঠনের কথা বলেছেন।

বিপদে মানুষ পড়তেই পারেন এবং তা থেকে হতাশাগ্রস্ত হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে সেখান থেকে নিজেকে তুলে ধরতে রাস্তা দেখিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বলেছেন, "নিজেদের বিপদ থেকে টেনে তোলো! তোমার ইচ্ছার সাধন তোমাকেই করতে হবে, ভীত হয়োনা, বারবার বিফল হয়েছো বলে নিরাশ হয়োনা। কাল সীমাহীন, অগ্রসর হতে শেখো, বারবার তোমার শক্তি প্রকাশ করতে থাকো, আলোক আসবেই।" অর্থাৎ যুবসমাজ যদি কোনো কারণে কোনো কাজে বিফল হয় যেখান থেকে হতাশ না হয়ে অদম্য শক্তি দিয়ে নিজেকেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করে অগ্রসর হতে বলেছেন।

কিভাবে জগতের পরিবর্তন সাধন করা যায় সেটি স্বামীজী যুবসমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। স্বামীজী বলেছেন, "কেবল শারীরিক সাহায্য দ্বারা জগতের দুঃখ দূর করা যায় না। যতদিন না মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইতেছে, ততদিন এই শারীরিক অভাবগুলি সর্বদাই আসিবে এবং দুঃখ অনুভূত হইবেই হইবে। যতই শারীরিক সাহায্য করোনা কেন কোনো মতেই দুঃখ একেবারে দূর হইবে না। জগতের এই দুঃখ সমস্যার একমাত্র সমাধান মানবজাতিকে শুদ্ধ ও পবিত্র করা। আমরা জগতে যাহা কিছু দুঃখ ও কষ্ট দেখিতে পাই, সবই অজ্ঞান বা অবিদ্যা হইতে প্রসূত, মানুষকে জ্ঞানালোক দাও, সকল মানুষ পবিত্র আধ্যাত্মিক-বলসম্পন্ন ও শিক্ষিত হউক। কেবল তখনই জগত হইতে দুঃখ নিবৃত্তি হইবে, তাহার পূর্বে নহে। দেশের প্রতিটি গৃহকে আমরা দাতব্য আশ্রমে পরিণত করিতে পারি, হাসপাতালে দেশ ছাইয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু যতদিন না মানুষের স্বভাব বদলাইতেছে, ততদিন দুঃখ-কষ্ট থাকিবেই থাকিবে।"

স্বামীজী যুবসমাজকে ভাব ও সংকল্পকে কার্যে পরিণত করতে বলেছেন। তিনি নাম, যশ বা কোনো তুচ্ছ জিনিসে পেছনে না তাকিয়ে কাজ করতে বলেছেন, তিনি সবার আগে স্বার্থকে বিসর্জন দিতে বলেছেন।

স্বামীজী যুবসমাজকে অলসতা থেকে বেরিয়ে এসে কর্মঠ হতে বলেছেন। তিনি যুবকদের বোঝাতে চেয়েছেন, অলসতাই ভারতের বিকাশের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। অলসতা দূর করার জন্য তিনি বলেছেন, "দূর করো যত আলস্য, দূর করে দাও ইহলোক ও পরলোক ভোগের বাসনা। আগুনে ঝাঁপ দাও আর মানুষকে ভগবানের দিকে নিয়ে এসো।" স্বামীজী সদাই জীবসেবার কথা বলেছেন। তিনি অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বরের বাস তিনি মনে করতেন তাই তিনি যুবকদের বলেছেন, "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

স্বামীজী ধর্মের মাধ্যমে নির্বাণ লাভ নয়, সৈন্যের যুদ্ধের মতো কাজের মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করতে বলেছেন। এই প্রসঙ্গে যুবকদের প্রতি তাঁর উপদেশ হল, "আমি চাই তোমরা কাজ করতে করতে মরেও যাও, তবু তোমাদের লড়তে হবে। সৈন্যের মতো আজ্ঞা পালন করে মরে যাও, নির্বাণ লাভ করো, কিন্তু কোনো প্রকার ভীরুতা চলবে না।"

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা থেকে 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' প্রসঙ্গটি আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখেছেন —

"জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন,
শিয়রে শমন, ভয় কী তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর
মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতা মাঝে।
পূজা তার সংগ্রাম অপার,
সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ মান,
হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।।"

অঙ্গীকার

রাজু হালদার (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

ওই হেন স্বপ্ন আমি দেখিতে চাই না
যে স্বপ্নে শান্তির কোন বালাই নেই,
আছে শুধু একরাশ আর্তনাদ, আতঙ্ক, বর্বরতা।
নিমিলিত নয়নে ভালোই আছি,
কিন্তু রুদ্ধ চোখে অন্ধকার এসে খাবি খায়,
একরাশ দুঃখ, যন্ত্রণা, বেদনায় জর্জরিত সন্ধ্যা।
তবুও আমি বুজবো নয়ন
দেখবো স্বপ্ন, ভাঙবো অহংকার
হোক না বেদনা, করবো ভাঙন
থাকবো এক কলঙ্কিত সন্ধ্যার অপেক্ষায়।।

রামপ্রসাদ সেন ও উত্তর সাধক

কৌস্তভ ঘোষ (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি তাঁকে মা মা বলে প্রার্থনা করছিলে। এ-খুব ভাল। কথায় বলে, মায়ের টান বাপের চেয়ে বেশি। মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর চলে না।

ত্রৈলোক্যের মায়ের জমিদারী থেকে গাড়ি গাড়ি ধন আসছিল, সঙ্গে কত লাল পাগড়িওয়ালা লাঠি হাতে দারোয়ান।

ত্রৈলোক্য রাস্তায় লোকজন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, জোর করে সব ধন কেড়ে নিলে। মায়ের দানের উপর খুব জোর চলে। বলে নাকি ছেলের নামে তেমন নালিশ চলে না।

বিজয় — ব্রহ্ম যদি মা, তা হলে তিনি সাকার না নিরাকার?

শ্রীরামকৃষ্ণ — যিনি ব্রহ্ম, তিনি কালী (মা আদ্যাশক্তি)।

যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় — এই সব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলচে দুলচে, শক্তি বা কালীর উপমা। কালী! কিনা — যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের) সহিত রমণ করেন। কালী "সাকার আকার নিরাকারা।" — তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে সেইরূপ চিন্তা করবে। একটা দৃঢ় করে তাঁর চিন্তা করলে তিনিই জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন। শ্যামপুকুরে পৌঁছিলে তেলীপাড়াও জানতে পারবে। জানতে পারবে যে তিনি শুধু আছেন (অস্তিমাত্রম্) তা নয়? তিনি তোমার কাছে এসে কথা কবেন — আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি। বিশ্বাস করো সব হয়ে যাবে। আর-একটি কথা — তোমার নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস, তাই বিশ্বাস দৃঢ় করে করো। কিন্তু মতুয়ার বুদ্ধি [Dogmatism] করো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বলো না যে তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। বলো আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আর কত কী হতে পারেন তিনি জানেন। আমি জানি না। বুঝতে পারি না। মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা করে কখনও দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে দেন, তবে বুঝা যায়; নচেৎ নয়।

'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি তিনিই মা।'

"প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি, ঝোঝনা রে মন ঠারে ঠোরে।।
আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।" অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব করছি। তাঁরেই মা মা বলে ডাকছি। আবার রামপ্রসাদ ওই কথাই বলছেন, —

আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম, ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।

"অধর্ম কিনা অসৎ কর্ম। ধর্ম কিনা বৈধী কর্ম — এত দান করতে হবে, এত ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে, এই সব ধর্ম।"

রামপ্রসাদের গানে দেখা গেল, কালীকৃষ্ণে কোনো প্রভেদ তিনি দেখছেন না। অনায়াসে বলতে পারলেন, "শ্যামা হলি মা রাসবিহারী / নটবর বেশে বৃন্দাবনে।" হিন্দু ধর্মে ভেদজ্ঞান তিনি কার্যত দূর করেছিলেন। হয়তো এই ব্যাপারে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও প্রভাবিত করেছেন। রামপ্রসাদের মহাপ্রয়াণের প্রায় ষাট বছর বাদে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তৎকালীন সময়ে রামপ্রসাদ তাঁর কবিত্বের স্ফূরণে দূর করতে চাইলেন শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্যদের বহিরঙ্গের বৈষম্য।

"মন করোনা দ্বেষা-দ্বেষী
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী।।
আমি বেদাগম পুরাণে
করিলাম কত খোঁজ তালাসি।
ঐ যে কালী, শিব, রাম
সকল আমার এলোকেশী।"

দেখা যাচ্ছে তাঁর সঙ্গীতে শিবরূপে শিঙ্গা ধরেন, কৃষ্ণরূপে বাজান বাঁশি, রামরূপে ধরেন ধনু, কালরূপে হাতে অসি। তাঁর কাব্যে শ্মশানবাসিনী শ্যামা, অযোধ্যা নিবাসী রাম অথবা গোকুল নিবাসী কৃষ্ণ একাকার। শ্রীরামকৃষ্ণের "যত মত তত পথ"-এর পূর্বে হিন্দু ধর্মের মধ্যে একত্রীকরণের বীজ বাংলায় নিহিত ছিল রামপ্রসাদের কাব্যে। অষ্টাদশ শতকে বাংলায় ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয় রামপ্রসাদের নেতৃত্বে।

অন্তর দিয়ে মায়ের গান গাইতে বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলছেন — 'জীবনটাকে গণিত কোরো না। জীবনটাকে সঙ্গীত করো। অন্তর দিয়ে মায়ের গান গাইলে, তবেই মা ধরা দেন।' এক কথায় মাকে পাওয়ার সহজ উপায় হল গান। যে-কথা আচরণে ও সহজ সরল বোধগম্য ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন ঠাকুর। গানকেই পাথেয় করেছিলেন তিনি।

কথামৃত গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে আমরা মোট চব্বিশটি রামপ্রসাদের গান শুনতে পাই। কোনো কোনো গান ঠাকুর একাধিকবার গেয়েছেন। গানগুলি রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর মনে বিশেষ সম্মান লাভ করেছে। এই তথ্যগুলি আমরা পাচ্ছি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার থেকে ১৯৯১ সালে প্রকাশিত 'শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সংগীত' বইটিতে। বইটিতে আরো পাচ্ছি রামপ্রসাদের আরো চারটি পদ ঠাকুর কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করছেন।

কালী-সাধক রামপ্রসাদ, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মের পূর্বেই জীবিত ছিলেন এবং ইহলীলা সংবরণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের বহুধা বিভক্ত হিন্দু সমাজ সেই সময় সনাতন ধর্মের ভেতরে সমন্বয় খোঁজার দিকে অধিক মনোনিবেশ করেছিল। ভক্তি আন্দোলন ছিল তারই এক অন্যতম তাগিদ। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলায় আধ্যাত্মিক নবজাগরণ সম্পন্ন হল।

"যে গাব গাছ হইতে তিনি ভাবের ঘোরে পদ্মফুল আনিয়া মায়ের পায়ে দিয়াছিলেন, তাহা তখনও তাঁহার জীর্ণ চালার পাশেই রহিয়াছে। তখনও প্রতি বৎসর সেখানে কালীপূজা হইত।" ১৮৯৬ সালে হালিশহরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহামায়ার-দুলাল রামপ্রসাদের সাধনপীঠ দর্শন করে 'স্মৃতি-কথা' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। তন্ত্রাচার্য ও যোগী, পরমপূজ্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে শক্তির

উদ্বোধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কুমারহট্ট-নিবাসী (বর্তমান হালিশহরের গঙ্গা তীরবর্তী জনপদ) জগন্মাতার ভাবোন্মাদ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

হালিশহরের স্থান-মাহাত্ম্য যেমন 'কবিকঙ্কন চণ্ডী' রচয়িতা মুকুন্দ চক্রবর্তীর লেখায় পাই —
"বামদিকে হালিশহর, দক্ষিণে ত্রিবেণী।
দু'কুলের যাত্রী রবে কিছুই না শুনি।
লক্ষ লক্ষ লোক এক ঘাটে করে স্নান।
বাস হেম তৈল ধেনু কেহ করে দান।।"

চারিদিকে কলরবের মাঝেও একটি নিরুপদ্রব নির্জনতা, আর তারই মাঝে ঘন সন্নিবিষ্ট ক্ষুদ্র-বৃহৎ বৃক্ষে পরিপূর্ণ একটি স্থান। মাঝে মাঝে এরণ্ডের বিস্তৃত জঙ্গাল। অদূরেই পতিতপাবনী গঙ্গা। স্থানটিকে সাধনভজনের জন্য পছন্দ হল। এই উদ্যানের মধ্যেই পঞ্চবটী রচনা করে তার তলায় সর্প-ভেক-শশ-শৃগাল-নরমুণ্ডে পঞ্চমুণ্ডীর আসন তৈরি করে নিলেন রামপ্রসাদ। মাতৃমূর্তি নির্মাণ করে চললো পুজো-হোম-জপতপ। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা মাত্রই সাধকের ডাকে মূর্তিমতি হলেন প্রাণময়ী। ভক্তের উদ্বোধনে উদ্বোধিতা ক্ষেমঙ্করী। অভয়ার অভয়পদে সঁপে সঙ্গীত সাধনায় আদ্যাশক্তির স্বরূপ মানুষের চৈতন্যে প্রোথিত করলেন। রচিত হল সাধনমার্গের উচ্চতম সঙ্গীত। একশো বছর পরেও তা প্রাসঙ্গিক রয়েছিল পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে। কথামৃতে তার উল্লেখ আছে। কথামৃতে ১৮৮৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখের কথোপকথনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন — "গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ। ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বরদর্শন হয়।" আবার ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসের কথোপকথনে ঠাকুর বলছেন — "রামপ্রসাদ সিদ্ধ, তাই তার গান ভালো লাগলো।" শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদ সেনকে সিদ্ধ পুরুষ হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও যে পরম শ্রদ্ধাশীল হয়ে রামপ্রসাদী গান গাইতেন, যে সাক্ষ্য দিচ্ছেন ভগিনী নিবেদিতা। Notes of some wondering with Swami Vivekananda গ্রন্থের পাতায় পাচ্ছি — "নৌকা স্রোতের অনুকূলে চলিতেছে আর তিনি রামপ্রসাদের গানগুলি একের পর এক গাহিয়া চলিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে একটু আধটু অনুবাদ করে দিতেছেন"। স্বামীজী রামপ্রসাদের 'এ সংসারে ডরি কারে' গানটির উল্লেখ করে বলছেন — "এই রূপ অভিমান সর্বদা মনে জাগিয়ে রাখতে হবে।" ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত প্যাসাডেনার শেক্সপীয়র ক্লাবে স্বামীজী ভারতীয় নারীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে রামপ্রসাদকে Great saint মহাসাধক বলেই উল্লেখ করেছেন। পরমহংস যোগানন্দজীও এই সঙ্গীতে ছিলেন আপ্লুত। ভগিনী নিবেদিতা রামপ্রসাদীকে বিশেষ মর্যদায় ভূষিত করেছিলেন।

সন্তান যখন মা বলে ডাকে তখন তার সেই ভক্তির সঙ্গে মিশে থাকে অভিমান। কেবলমাত্র শ্রদ্ধা যেন মা কে একটু দূরেই সরিয়ে রাখে। সন্তান ভাব নিয়ে যে মার কাছে উপস্থিত হয়, সে মার সাথে একটু কোন্দল করতে পারে, একটু অভিমান করে, একটু বিবাদও করতে পারে। এমন সুন্দর অভিমানের প্রকাশ বৈষ্ণব সাহিত্যেও দেখতে পাই। রামপ্রসাদ যেন তাঁর মা কে ছেড়ে কথা বলেন না। দুঃখে অভিমানে তাঁকে দুই কথা শুনিয়ে দেন। ১৮৮৩ সালের ২৭ মে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে ঠাকুর গাইছেন —

"মায়ে পোয়ে দুটো দুঃখের কথা কই"।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারমশাইকে জাগতিক দুঃখ এবং সুখের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, যতক্ষণ দেহবুদ্ধি ততক্ষণই সুখ-দুঃখ জন্ম মৃত্যু রোগ শোক। দেহের এই সব আত্মার নয়। আত্মজ্ঞান হলে জন্ম মৃত্যু সুখ-দুঃখ স্বপ্ন বলে বোধ হয়।

প্রসাদী সুরে যেন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের প্রাণের কথাই বলেছেন। ১৮৮২ সালের ৫ই আগস্ট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়িতে বসে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "রামপ্রসাদ মনকে বলেছে — ঠারে ঠোরে বুঝতে"। নির্গুণ নির্বিকার ব্রহ্ম হলেন ভ্রমের অধিষ্ঠান। রজ্জুতে অধ্যস্ত সর্পের দ্বারা রজ্জু যেমন তিলমাত্র প্রভাবিত হয় না, তেমনই নির্গুণ নির্বিকার ব্রহ্মবস্তু অধ্যস্ত জগতের দ্বারা কোনওভাবেই প্রভাবিত হন না। রামপ্রসাদের গানেরই পুনরুল্লেখ করতে হয় — কে জানে কালী কেমন! মা যদি কৃপা করে তাঁর সন্তানকে স্বরূপ চিনিয়ে না দেন, তবে সাধ্য কী জীব তাঁকে জানে! মহামায়ার শক্তিতেই সব কিছু হচ্ছে। শ্রুতিতেও বলা হয়েছে, তাঁরই শক্তিতে সূর্য কিরণ দিচ্ছে, সমীরণ বয়ে যাচ্ছে।

রামপ্রসাদের ভাষায় — কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি। মাতৃসাধক রামপ্রসাদ উপলব্ধির অতি গভীরে প্রবেশ করে যে কথাখানি বলেছেন তা মাতৃতত্ত্বের প্রতিই স্পষ্ট ইঙ্গিত করে। মনে রাখতে হবে, কালীই শক্তি আবার কালীই জগন্মাতা। সে অর্থে আমরা সবাই এক মায়েরই সন্তান।

রামপ্রসাদ যে কথা গানে বলেছেন, সে কথাই বহু যুগ পরে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস — ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ।

তাই যিনি ব্রহ্ম জেনেছেন, তিনি কালী বা শক্তি জেনেছেন, যিনি কালী বা শক্তি জেনেছেন, তিনি ব্রহ্ম জেনেছেন।

দুয়ের মধ্যে যে কোনও পার্থক্য নেই। এদিকে আবার শ্রুতিতে আছে — ব্রহ্মবেদো ব্রহ্মৈব ভবতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ সে কথা বলছেন অনবদ্য ভাষায় — নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে সমুদ্রে নেমে নিজেই গলে গেল।

তাই তো রামপ্রসাদও বললেন, যিনি কালীকেই ব্রহ্ম জানলেন — তিনি ধর্মাধর্মের অতীত হলেন। ব্রহ্মবস্তু তথা মাতৃতত্ত্ব, যাঁর উপলব্ধিতে ধরা দিয়েছে, সেই আত্মজ্ঞের কাছে ধর্ম যেন জলের দাগের মতোই মুছে গিয়েছে। এ অবশ্য সব শেষের কথা।

স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেললে, দুললে তখন কালীর উপমা। এ ব্যাখ্যা শ্রীরামকৃষ্ণের। তাঁর কথায়, কালী মহাকাল বা ব্রহ্মের সঙ্গে রমণ করেন। যদি তাঁকে নিরাকার বলে বিশ্বাস হয়, তা হলে তাঁকে সেই রূপে চিন্তা করতে হবে।

রামপ্রসাদী গানের অন্যতম চমক —

"মন রে কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা।।
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া তার কাছেতে যম ঘেঁষে না।।"

এই গানটি শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে দুইবার গেয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গৃহী ভক্তদের কথাও চিন্তা করতেন। সার কথা হল এই মানব জীবনের অনিত্যের মধ্যেও সেই নিত্য মাতৃপদ লাভ করা যায়, করতেই হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের পঁয়ত্রিশ বছর কতবার যে শ্রীরামপ্রসাদের গান গেয়েছেন সে ঘটনার সাক্ষী শুধুমাত্র কথামৃত নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের দ্বারা রচিত তাঁর ইংরেজিতে ও বাংলাতে লিখিত পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থগুলি। রামচন্দ্র দত্ত তাঁর রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী গ্রন্থের পাতায় লিখেছেন — শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো কখনো সকাতরে মায়ের কাছে করুণ ভাবে প্রার্থনা করতেন, মা আমায় দয়া কর মা, তুই রামপ্রসাদকে দয়া করলি, আমাকে কেন করবি না মা।

পরিশেষে, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরামপ্রসাদের কি প্রকার আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল সে বিষয়ে একালের একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রী শশীভূষণ দাশগুপ্তের 'ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' (১৯৬০) বইটি থেকে উদ্ধৃত করব ঃ "বাংলাদেশের শক্তি সাধনায় রামপ্রসাদ যে সুর তুলিলেন, দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী শ্যামার পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আমরা সেই সুরের পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করিতে পারি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও রামপ্রসাদের সুর যেন একাকার হয়ে এক অখণ্ড ভক্তিরসের সৃষ্টি করেছে।

ডাক্তার সরকার গাড়িতে চলেছেন। সঙ্গে মাস্টারমশায়। পথে দু-চারটি রোগী দেখে ডাক্তার সরকার শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে যাবেন। পথে তিনি বলেন ঃ ইনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) দেখছি কালীর উপাসক।

মাস্টারমশায় বলেন ঃ তাঁর কালী মানে আলাদা। বেদ যাঁকে পরমব্রহ্ম বলেন, তিনি তাঁকেই কালী বলেন। মুসলমান যাঁকে আল্লা বলে, খ্রীস্টান যাঁকে God বলে, তিনি তাঁকেই কালী বলেন। তিনি অনেক ঈশ্বর দেখেন না, এক দেখেন। পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে গেছেন, যোগীরা যাঁকে আত্মা বলেন, ভক্তেরা যাঁকে ভগবান বলেন, পরমহংসদেব তাঁকেই কালী বলেন।

তথ্যসূত্র ঃ—

* শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা। প্রথম খণ্ড। ৭৩ পৃষ্ঠা

১। কল্পনা সেন, 'রামপ্রসাদ সেন ও সমকালীন ভারতবর্ষ', সুচেতনা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা, ১৮ আষাঢ়, ১৪১৮।

২। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' শ্রীম কথিত, শুভম প্রকাশনী, কোলকাতা, প্রকাশকাল ১লা জানুয়ারি, ২০০৮।

৩। স্বামী বামদেবানন্দ — 'সাধক রামপ্রসাদ', কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ষষ্ঠ সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৬৩।

৪। শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য', সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৮৭।

৫। জহর সেন মজুমদার, 'মধ্যযুগের কাব্য স্বর ও সংকট', কোলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৯।

৬। Notes of some wondering with Swami Vivekananda by Sister Neivedita, Printed by K. C. Ghose at the Lakshmi Printing Work, J, 64-1, 64-2, Sukea Street, Calcutta, 1913.

বিস্মৃতির অন্তরালে ঢাকেশ্বরী মাতা

আকাশ নীল বিশ্বাস (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

"ঢাকেশ্বরী জগন্মাতঃ ত্বংখলু ভক্ত বৎসলা।
স্বস্থানাৎ স্বাগতা চাত্র স্বলীলয়া স্থিরা ভবঃ।।"

— অর্থাৎ "হে জগন্মাতা ঢাকেশ্বরী তুমি স্বয়ং ভক্তবৎসলা, তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি, তুমি কৃপা করে এই স্থানে স্বমহিমায় অবস্থান করো।" — 'কলকাতা' নামটির উদ্ভব যেমন সম্ভবত 'কালীক্ষেত্র' থেকে তেমনি 'ঢাকা' নামটির উদ্ভব জগৎ-জননী 'ঢাকেশ্বরী' মাতার নাম থেকে। দ্বাদশ শতকে অর্থাৎ আদি মধ্যযুগে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন সেন সম্রাট বল্লাল সেন। পাশাপাশি রাঢ়ের কল্যাণেশ্বরী মন্দির, রাঢ়েশ্বর শিবমন্দির ও গৌড়ের গৌড়েশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি।

লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হলো সম্পূর্ণ মন্দিরটি চুন-বালির গাঁথনিতে নির্মিত — যা তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের স্থাপত্য শৈলীর সঙ্গে একেবারেই মানানসই নয়! কারণ সেযুগের ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পে মর্টার হিসেবে চুন-বালির মিশ্রণের ব্যবহার অজানা ছিলো বলেই মনে করা হয়। অতএব এই স্থাপত্য-নিদর্শনটি নিঃসন্দেহে সমকালীন বঙ্গভূমের সুউন্নত স্থাপত্য-কৌশলেরই ইঙ্গিত বহন করে। মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বিষয়ে বহুবিধ মতামত থাকলেও সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতানুসারে মোট দুটি তথ্য উঠে আসে —

(১) রাজা আদিসুর তাঁর এক রাণীকে বুড়িগঙ্গার অরণ্যে নির্বাসন দিলে সেখানেই রাণী জন্ম দেন পুত্র বল্লাল সেনকে। শৈশবকালীন দিনগুলি সেখানেই অতিবাহিত করার সময়ে বালক বল্লাল অরণ্য মধ্যে একটি দুর্গামূর্তি আবিষ্কার করেন। এর থেকে তাঁর মধ্যে বিশ্বাস জন্মায় যে জঙ্গালের যাবতীয় বিপদ-আপদ-দুর্বিপাক থেকে এই দেবীই তাঁকে রক্ষা করছেন। ফলতঃ রাজসিংহাসনে আসীন হলে নৃপতিশ্রেষ্ঠ বল্লাল উক্ত স্থানটির সংস্কার সাধন করে সেখানে একটি মন্দিরের স্থাপনা করেন। অতঃপর সেখানেই তিনি দেবীবিগ্রহটিকে প্রতিষ্ঠা করেন।

(২) মহারাজা বিজয় সেনের শূর বংশীয়া মহিষী বিলাসদেবী লাঙ্গালবন্দ থেকে স্নানকার্য সমাপন করে ফেরার পথেই পরবর্তী রাজনরেশ বল্লাল সেনকে প্রসব করেন। পরে নৃপতি বল্লাল স্বপ্নাদেশ পেয়ে ওই স্থান থেকে মাতৃকা মূর্তিটিকে আবিষ্কার করেন এবং স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী দেবীর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে ও তাঁর জন্মস্থানকে মহিমান্বিত করার জন্য সেখানে ওই মন্দিরটির নির্মাণ করান।

মনে করা হয় যে, বাংলার সুবেদার থাকাকালীন মুঘল সেনাপতি মানসিংহ মন্দিরটির জ্বরাজীর্ণ অবস্থা দেখে সেটিকে সংস্কারের উদ্যোগ নেন। সংস্কারের সময় তিনি মন্দির প্রাঙ্গণে চারটি শিবলিঙ্গ ও চারটি শিবমন্দিরও নির্মাণ করেন — যদিও এই ঘটনার কোনো সুনির্দিষ্ট নথিবদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই

ঢাকেশ্বরী মন্দিরকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীতে 'ঢাকা' নামক সমৃদ্ধ জনপদটির উদ্ভব হয়। মা ঢাকেশ্বরী এই শহরের রক্ষাকত্রী, অধিষ্ঠাত্রী — তাঁর নামেই এই শহরের 'ঢাকা' নামকরণটি হয়েছে। তিনি ঢাকার ঈশ্বরী, তাই 'ঢাকেশ্বরী'। স্বাভাবিকভাবেই এই ঢাকেশ্বরী নামকরণটির পিছনেও উঠে এসেছে একাধিক কিংবদন্তি; যেমন —

(১) দেবাদিদেব মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্য থামাতে যখন ত্রিলোকেশ্বর শ্রীবিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্রের সাহায্যে সতীর দেহকে খণ্ড-বিখণ্ড করছিলেন তখন ৫১টি দেহাংশের মধ্যে সতীর কিরীট বা মুকুটের 'ডাক' (প্রজ্জ্বলিত গহনার অংশবিশেষ)টি ছিন্ন হয়ে পৃথিবীর যে স্থানে পড়ে সেখানে একটি উপপীঠের জন্ম হয়। সতীর শিরোভূষণের এই 'ডাক' থেকেই 'ঢাকেশ্বরী' নামটির উৎপত্তি।

(২) 'অরিরাজ নিঃশঙ্ক শঙ্কর' বল্লাল সেনের স্বপ্নে দর্শিত দেবী মূর্তিটি ছিল গুপ্ত বা আচ্ছাদিত, পরে জঙ্গল থেকেও বিগ্রহটিকে ঢাকা বা আচ্ছাদিত অবস্থায় পাওয়া যায়। যেহেতু দেবীমূর্তিটি ছিল ঢাকা অর্থাৎ সুপ্ত অবস্থাপ্রাপ্ত তাই তাঁর নাম হয় ঢাকেশ্বরী। সহজ কথায়, আবিষ্কারকালীন সময়ে দেবীপ্রতিমাটি ঢাকা অবস্থায় ছিলো বলেই তাঁর 'ঢাকা-ঈশ্বরী' বা 'ঢাকেশ্বরী' নামকরণ হয়।

ঢাকেশ্বরী দেবীর মূল মন্দির বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত হলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণে দেশভাগের পর ১৯৪৮ সাল নাগাদ বিশেষ বিমানে করে মন্দিরের বিগ্রহটিকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। কলকাতা শোভাবাজারের ধনবান ব্যবসায়ী দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতে ঢাকেশ্বরী মাতা নিত্যপূজা পেতেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কুমোরটুলিতে একটি মন্দির নির্মাণ করে বিগ্রহটিকে সেখানেই প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরিবারের তরফ থেকে নিয়মিত পূজার্চনার ব্যবস্থাও করে যান।

'কালীক্ষেত্র' কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র কুমোরটুলির দুর্গাচরণ স্ট্রিটে অবস্থিত এই ঢাকেশ্বরী মায়ের মন্দির। দেশভাগ পরবর্তী দাঙ্গার জেরে ঢাকেশ্বরী মাতার বিগ্রহটি ক্ষতিগ্রস্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এই আশঙ্কায় হরিহর চক্রবর্তী ও রাজেন্দ্রকিশোর তিওয়ারি (মতান্তরে প্রহ্লাদকিশোর তিওয়ারি) নামক দুই ব্যক্তি তাঁদের বিশেষ উদ্যোগে দেবিমূর্তিটিকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন। প্রায় ৮০০ বছরেরও বেশি প্রাচীন এই ঢাকেশ্বরী মাতা কলকাতায় আগমনের পরবর্তী প্রথম দুটি বছর হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রিটের দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরীর বাড়িতেই পূজিতা হন। পরবর্তীতে তিনি কুমোরটুলি অঞ্চলে ঢাকেশ্বরী মা'র জন্য একটি স্বতন্ত্র মন্দির নির্মাণ করে দেন এবং নিত্যসেবার জন্য কিছু দেবোত্তর সম্পত্তিও দান করেন।

বলা হয় যে, আজমগড়ের যে তিওয়ারি পরিবারকে মানসিংহ এই মন্দিরের সেবায়েত নিযুক্ত করেছিলেন, তাদের বংশধরেরাই পরবর্তীতে কলকাতায় এসে পুনরায় মন্দিরের সেবায়েত নিযুক্ত হন। বাংলাদেশের ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বর্তমানে দেবীর যে বিগ্রহটি রয়েছে সেটি মূল মূর্তির প্রতিরূপ। সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী মূল দেবী প্রতিমাটির উচ্চতা দেড় ফুটের মতো, যার দুই পাশে অবস্থান করছেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী, নিচে কার্তিক ও

গণেশ। পরবর্তী সময়ে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ উপায়ে প্রায় অলংকারহীন অবস্থায় দেবীপ্রতিমাটিকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিলো, যার ছবিও কলকাতার ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পাওয়া যায়।

বিশ শতকের প্রথম দশকে ভাওয়াল পরগনার রাজা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় মন্দিরটিকে সংস্কার সাধন করে ২০ বিঘা জমি দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে নথিভুক্ত করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী খান সেনাদের গোলাগুলিতে মন্দিরটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। পরবর্তীতে যথাযথ সংস্কার কার্যের মাধ্যমে মন্দিরের হৃতসৌন্দর্য পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়। অবশ্য দেশভাগ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান (পরে বাংলাদেশ) সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে দফায় দফায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর ব্যাপক হারে শোষণ ও নিপীড়ন শুরু হলে মন্দিরের অনেক সেবায়েত ও পুরোহিত দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন।

শুধু তাই নয়, ১৯৪৮ সালের 'ভূমি অধিগ্রহণ আইন', ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভারত-পাক যুদ্ধ, 'শত্রু সম্পত্তি আইন' (১৯৬৯) প্রভৃতির সাহায্যেও মন্দিরের জমি ও সম্পত্তি মাত্রাতিরিক্তভাবে বেদখল করা হয়। ঢাকেশ্বরী মন্দির বাংলাদেশের জাতীয় মন্দির হলেও বাংলাদেশের জাতীয় সরকার ও মৌলবাদী শক্তির প্ররোচনায় সেদেশের অন্যান্য হিন্দু মন্দিরগুলির মতো এটিরও স্থাবর সম্পত্তির সিংহভাগই আজ বেহাত হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে মন্দিরের মোট ২০ বিঘা জমির ১৪ বিঘাই অপহৃত। বিভিন্ন সময়ে এই বেদখলীকৃত জমি পুনরুদ্ধারের দাবি জানানো হলেও সরকারি তরফে এবিষয়ে কোনো পদক্ষেপই গৃহীত হয়নি। তার ওপরে ১৯৬৯ সালের 'শত্রু সম্পত্তি আইন' (বর্তমানে 'অর্পিত সম্পত্তি আইন') নামক কালা কানুনটির মাধ্যমেও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের জমি দখলের পথ প্রশস্ত করা হয়েছে।

তবে যাবতীয় সরকারি অসহযোগিতা এবং মৌলবাদী শক্তির মিথ্যা প্ররোচনা ও ক্রমাগত অপচেষ্টা সত্ত্বেও আজও মন্দিরটি সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে বহু বঞ্চনা ও গৌরবের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের জন্য 'নহবতখানা তোরণ' নামক একটি সিংহদুয়ার রয়েছে। সমগ্র মন্দিরাঙ্গনটি একাধিক সৌধ ও পূজামণ্ডপ, কয়েকটি অপ্রধান মন্দির, একটি পান্থশালা, প্রশাসনিক ভবন ও গ্রন্থাগার, কি সুন্দর ফুলের বাগান, বেশ কয়েকটি ঘর ও একটি সুবিশাল দীঘির সমন্বয়ে গঠিত। দীঘিটির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি সুপ্রাচীন বটগাছ অবস্থিত। দীঘির দুপাশ সুন্দরভাবে বাঁধাই করা, দীঘিতে বিভিন্ন প্রজাতির ছোটোবড়ো মাছের উপস্থিতিও রয়েছে, কাছাকাছি কয়েকটি সমাধিও দৃশ্যমান। বিবিধ জাতের ফুলগাছও মন্দিরটির শোভাবর্ধনে সহায়ক হয়েছে।

পথবিবরণী ঃ— বাংলাদেশের ঢাকেশ্বরী মন্দিরে যাওয়ার পথবিবরণী আপনারা উইকিপিডিয়াতেই পেয়ে যাবেন; তাই এখানে রইলো কলকাতার শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী মাতার মন্দিরে যাওয়ার বিস্তারিত পথনির্দেশিকা। শোভাবাজারে নেমে রবীন্দ্র সরণি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কুমোরটুলি সর্বজনীনের পাশেই এই মন্দিরের অবস্থান। এই রাস্তাতেই ডানদিকে পড়ে 'উত্তর কলকাতার গিন্নি' সিদ্ধেশ্বরী মায়ের মন্দির, তারপর বামদিকের গলি দিয়ে হাঁটলেই পড়বে বহুকাঙ্ক্ষিত ঢাকেশ্বরী মাতার মন্দির। এটির নিকটেই আছে বাগবাজারের শ্রী শ্রী সর্বমঙ্গলা

কালীমাতার মন্দির। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত মশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, সম্প্রতি সেখানে পশুবলি বন্ধ হয়ে গেছে, কেবল দুর্গানবমীর দিন আটটি চালকুমড়ো বলি হয়।

হাতে সময় থাকলে এর পরই যাওয়া যেতে পারে নিকটবর্তী বাগবাজারের শ্রী শ্রী সর্বমঙ্গালা কালীমাতার মন্দিরে। এই মন্দিরের পুরোহিত মশাইয়ের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে উঠে আসা তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, বর্তমানে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে পাঁঠাবলির সংখ্যা কমে গেলেও একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। কালীপুজোয় দীপাবলি অমাবস্যার দিনে একটি পাঁঠা মায়ের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয়; কয়েকটি মানতের পাঁঠাও থাকে। নিকটবর্তী অটোস্ট্যান্ডের অটোচালকরাও একটি পাঁঠা বলি দেন।

পরিশেষে একথা বলাই যায় যে, বাংলাদেশের ঢাকেশ্বরী মন্দিরের মতো কলকাতার ঢাকেশ্বরী মাতার মন্দিরও যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও ধর্মীয় তাৎপর্য বহন করে। বাঙালির শক্তিপূজার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন ও শক্তিপূজার সংস্কৃতি অবশ্যই বাঙালি জাতির ঐক্যবদ্ধতা ও গণসংস্কৃতির সাক্ষ্য বহনকারী। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে আমরা সকলেই কমবেশি ওয়াকিবহাল। তবে কেবলমাত্র জনসচেতনতা নয়, ভারত সরকারের সুচিন্তিত পদক্ষেপ ও সতর্ক হস্তক্ষেপই পারে এই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করতে। নচেৎ অন্যান্য হিন্দু মন্দিরগুলির মতো বাংলাদেশের ঢাকেশ্বরী মায়ের মন্দিরও ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন ও অধিগ্রহণের শিকার হতে হতে একসময় কালের করাল গ্রাসে তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে।

কোনো জাতির ধর্মীয় পরিচয়, তার শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করে। তার আরাধ্য উপাস্য ও উপাস্যের আরাধনাস্থল তার স্বতন্ত্র সত্তা, একতা ও আইডেন্টিটিকে ধারণ করে। তাই শুধু ভাষা দিয়ে নয়, ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য-বিশ্বাস প্রভৃতি সব কিছুর সমন্বয়েই একটি জাতির জাতিসত্তা নির্মিত হয়, সেই জাতিসত্তার উপর নির্ভর করেই জাগরিত হয় উক্ত জাতির জাতীয়তাবাদ। শাক্ত হিন্দুর অন্যতম শক্তিপীঠ এই ঢাকেশ্বরী মায়ের মন্দিরকে যথাযথ নিরাপত্তা দান ও রক্ষণাবেক্ষণের দাবি ভারত সরকারের কাছে সুদৃঢ় ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে পেশ করা তাই প্রত্যেক সমাজ-সচেতন ও স্বজাতিপ্রেমী বাঙালির অবশ্য কর্তব্য।

কেন শুনবো গান

ড. মানস কুমার মৌলিক, অধ্যাপক (সাম্মানিক)

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন একবার বলেছিলেন, "আমার আবিষ্কারগুলি যে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ঘটেছে তার পিছনে চালিকাশক্তি ছিল সংগীত। আমি বেহালা বাজিয়ে জীবনের সবচাইতে বেশি আনন্দ পেয়েছি।"

ভারতবর্ষের মিসাইল ম্যান হিসাবে যিনি পরিচিত সেই ডঃ এ. পি. জে আব্দুল কালামের কথায় "আমি নিশ্চিত যে শিল্প, সংগীত, নৃত্য এবং নাটক সমাজের একাধিক বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।" ভারতবর্ষের এগারতম রাষ্ট্রপতি তার বিজ্ঞানচর্চা এবং রাষ্ট্রীয় গুরুদায়িত্ব সামলেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর রুদ্রবীণার চর্চা অব্যাহত রাখেন।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সংগীতের অপরিসীম গুরুত্ব বোঝাবার জন্য যথেষ্ট।

আমরা যদি শিল্পের শ্রেণীবিভাগে সংগীতের স্থান নির্ণয় করতে যাই তা হলে দেখবো চারুশিল্প [Fine arts]-এর দুটি বিভাগ যথাক্রমে মানবিক শিল্প [Humanistic art] এবং সুক্ষ্মতর শিল্প [Finer art]। নৃত্য, সংগীত দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।

ভারতীয় ঋষিরা মনে করতেন, শিল্পবস্তু বিশেষ করে সংগীত প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মস্বরূপের সঙ্গে একাত্ম। রবীন্দ্রনাথ শিল্পকে তথা সংগীতকে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গালের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছেন।

ইউরোপীয় চিন্তানায়করা কিন্তু সংগীতকে এত গভীরভাবে দেখেন নি। অ্যারিস্টটল শিল্পের মধ্য দিয়ে জগৎ সংসারের অন্তর্নিহিত ছন্দ এবং সুষমাবোধ প্রত্যক্ষ করেছেন, আবার টলস্টয় তাঁর 'What is art' গ্রন্থে বলেন "শিল্পী মনে যে সমস্ত অনুভূতি কাজ করে তাই শিল্পের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়ে ব্যক্তি এবং সমাজের কল্যাণধর্মিতায় কাজ করে।"

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সংগীতের সীমারেখা নির্ণয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন 'হার্মনি বা স্বরসঙ্গতি ইউরোপীয় সংগীতের প্রধান বস্তু আর রাগ, রাগিনী আমাদের সংগীতের মুখ্য অবলম্বন। সংগীতে ইউরোপ 'বিচিত্রের' দিকে দৃষ্টি রেখেছে আর আমরা 'একের' দিকে।

ভারতবর্ষের অতীত গৌরব থেকে শিক্ষা, চিকিৎসাবিদ্যার মানের কতটা উন্নতি হয়েছে তা তর্কসাপেক্ষ হলেও ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত কিন্তু তার গৌরব নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে যথেষ্ট সমাদৃত।

কোন বিচিত্র বিবর্তনের ধারায় ভারতীয় সংগীত বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক —

ভারতবর্ষের সঙ্গীতের উৎস হিসাবে 'সামবেদ'কে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'সাম' শব্দের অর্থ সুর এবং

'ঋক' ছন্দের উপর ঐ সুর সংযোজিত হয়ে সামগান বিকাশ লাভ করে। বৈদিক যুগে যাগ-যজ্ঞের সময় এই গানগুলি গাওয়া হত যার লক্ষ্য ছিল দেবতা ও ঋষিদের প্রশংসা করা। 'গ্রামগেয়, অরণ্যগেয়, উহ্য এবং উহ' এই চারপ্রকার ভাগের গান নিয়ে সামবেদের গানগুলি রচিত হয়েছিল।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মতে "গ্রামগেয় গান থেকে বৈদিকোত্তর গান্ধর্ব বা 'মার্গ' এবং মার্গ থেকে ক্রমশ ক্ল্যাসিক্যাল অভিজাত দেশী গানের সৃষ্টি হয়েছে।

গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তোমরের (১৪৮৬-১৫১৬) আমলে ভারতবর্ষে 'ধ্রুপদ' নামে একপ্রকার গায়নরীতির প্রচলন হয়। আকবরের রাজ্যসভায় সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে যার নাম অবিস্মরণীয় সেই তানসেনও ভালো ধ্রুপদ গাইতেন এবং রচনা করতেন। ঊনিশ শতকের শেষদিকে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যান্য গানের পাশাপাশি ওস্তাদ আমেদ খান এবং পরে বাণী গুপ্তের কাছে ধ্রুপদের তালিম নেন। মোঘল আমলের শেষ দিকে 'খেয়াল' গানের উৎপত্তি। ১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দে মোঘল সাম্রাজ্যের অবসানের পর 'শাহ্-সদারঙ্গ নিয়ামত' পূর্ণাঙ্গ খেয়াল গান রচনা করেন।

ভাগ্যের পরিহাসে একসময় যে খেয়াল গায়কদের ধ্রুপদিয়ারা পাত্তাই দিত না বর্তমানে সেই 'খেয়ালের' দাপটে ধ্রুপদ বিলুপ্তপ্রায়। খেয়ালের থেকে অন্য স্টাইলের গান ঠুংরি, দাদরাও এখন জনপ্রিয়।

চতুর্দশ শতক পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। "চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতীয় সংগীতে পারসীয় সংগীতের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং উত্তর ভারতীয় সংগীতের কিছু বিবর্তন ঘটে ফলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের ধারায় স্পষ্ট বিভাজন দেখা যায়" [H. A. Popley – 'The music of India']।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মতে (গ্রন্থ ঃ- রাগ ও রূপ) ঃ— '১৭শ শতাব্দীতে বেঙ্কটমুখী যখন ৭২টি ঠাটের প্রচলন করেন তখন থেকে উত্তর এবং দক্ষিণ (কর্ণাটকি) সংগীতের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়'। বর্তমানে উত্তর ভারতীয় রাগ সংগীতে দশটি (১০) ঠাটের প্রচলন রয়েছে।

সংগীত বিবর্তনের এই ধারাতে কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত, নজরুল গীতি, লোকগীতি, টপ্পা, কীর্তন বা নানান ধরনের বাংলা ও প্রাদেশিক গানের কথা ধরা হয়নি, কারণ ভাষার প্রতিবন্ধকতার জন্য এই গানগুলি আন্তর্জাতিক বেড়াজাল অতিক্রম করতে সক্ষম নয়।

ক্রিকেটীয় পরিভাষায় রাগসংগীতকে যদি টেস্ট ক্রিকেট বলা যায় তবে অন্যান্য গানগুলি T-20 অথবা O.D.I পর্যায়ের। টেস্ট ক্রিকেট যতই দর্শক কম থাকুক কিন্তু তার কৌলীন্য কতটা সেটা একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়ই জানে।

আট বা নয়ের দশকেও শাস্ত্রীয় সংগীত 'ঘরানার' বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। বড় বড় ওস্তাদেরা সংগীত সম্বন্ধে তাদের অধীত বিদ্যা পরিবারের মধ্যেই অথবা 'গাণ্ডীবাঁধা' অসীম প্রতিভাবান ছাত্রদেরই শুধুমাত্র

দিতেন। এর জন্যই বিভিন্ন ঘরানার মধ্যে গায়নরীতির এত পার্থক্য দেখা যেত। বিশ্ববিখ্যাত সেতারিয়া পণ্ডিত রবিশংকর বাবা আলাউদ্দীনের মেয়ে অন্নপূর্ণাকে (রোশেনারা খান) বিবাহ করার পরই 'সেনী ঘরানার' মণিমুক্তো লাভে সমর্থ হন।

ভারতবর্ষের মতো একটি দেশে যার সংগীত ঐতিহ্য বহু পুরানো সেখানে প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য সংগীতের কোন স্থান নেই। অথচ শিশু বয়স থেকে সংগীত শিক্ষা দিলে তার উপকারিতা অনেক। সংগীত শিক্ষা ভাষা দক্ষতার উন্নতি ঘটায়, মানসিক ক্ষমতা উন্নত করে, 'তাল' ও 'লয়ের' চর্চা শিক্ষার্থীদের গণিতে উন্নতির সহায়ক, স্মৃতিশক্তি ও সৃজনশীল ক্ষমতার উন্নয়ন ও সঙ্গীত চর্চার ফল। বিদ্যালয়ে যেহেতু একসঙ্গে সঙ্গীত শিখতে হয় তাই শিক্ষার্থীদের দলগত সংহতি বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে মিউজিক-থেরাপিতে অনেক রোগ নিরাময় সম্ভব হচ্ছে। সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে এবং ডেনমার্কের মত দেশগুলিতে বিদ্যালয় পর্যায়ে সংগীতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার স্কুলগুলিতে সংগীত শিক্ষার গুরুত্ব কিছুটা কম।

এবার সংগীত শিক্ষা নিয়ে মনস্তত্ত্ববিদদের মতামত নেওয়া যাক — ম্যাসলো [Maslow] সংগীত শিক্ষা বা শিল্পচর্চাকে মানুষের নান্দনিক চাহিদার [Aesthetic need] অন্তর্ভুক্ত করে একে বৃদ্ধিজনিত চাহিদা বলেছেন। সঙ্গীতচর্চা মানুষের নানা প্রাক্ষোভিক [Emotional] সমস্যার সমাধান করে। Howard Gardner [1983] যে আট রকম বুদ্ধির কথা বলেছেন তারমধ্যে Musical intelligence একটি বিভাগ। এই বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুরা ভবিষ্যতে গীতিকার, সুরকার, গায়ক হতে পারেন যদি শৈশবেই তাদের সঙ্গে সঙ্গীতের যোগসূত্র গড়ে ওঠে। আমাদের দেশের মহান সংগীতগুরুরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হলেও আশ্চর্য রকম নীরব যে কেন বিদ্যালয় পর্যায়েই শিক্ষার্থীদের সংগীতের হাতেখড়ি হওয়া উচিত! সম্প্রতি NCTE তাদের Teachers training curriculum-এ যোগশিক্ষাকে যেরকম ভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন সঙ্গীত কিন্তু ততটা গুরুত্ব পায়নি।

সংগীতের উপাদানগুলি যেমন কণ্ঠ, তাল-লয়ের বোধ, সুরের জ্ঞান এগুলি ঈশ্বরপ্রদত্ত [Gifted]। ঐ উপাদানগুলি থাকলে ঘষামাজা করে একটা স্তর অতিক্রম করা যায়। সংগীত শিক্ষার্থীদের সংগীতের প্রাথমিক স্তর পার করতেই অনেক সময় লেগে যায় তার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য্য। এর সঙ্গে বিভিন্ন 'মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট' কিনতে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু ভালো সংগীতের শ্রোতা তো সবাই হতে পারে। নিয়মিত শ্রবণের মাধ্যমে সংগীতের সাধারণ শ্রোতার থেকে 'বিশেষ শ্রোতা' হওয়া সম্ভব। এইভাবে প্রতিনিয়ত শ্রবণের মাধ্যমে সংগীতের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পায় তবে অবসর সময়ও আনন্দময় হয়ে উঠবে।

পরিশেষে বলব, রহড়া ব্রহ্মানন্দ কলেজ অব্ এডুকেশনে একজন ছাত্র হিসাবে সংগীত জীবন শুরু করে বর্তমানে সেখানেই অতিথি শিক্ষক হিসাবে যোগদান করে এবং এই পরিবারের একজন সদস্য হয়ে ওঠায় আমি কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর চরণে আমার শতকোটি প্রণাম নিবেদন করি।

বন্যার তাড়নায় ঘাটালের স্বর্ণ-শিল্পের উত্থান

সুব্রত জেলে (ছাত্র, বি.এড. প্রথম বর্ষ)

প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিভিন্নভাবে মানুষের কাছে হতাশা দুর্ভোগ নিয়ে আসে। এ রকমই বছরের পর বছর মানুষের বসতবাড়ি চাষের জমি সবকিছু নদী-গর্ভে তলিয়ে দিয়েছে বন্যা। অনেক ক্ষেত্রে এই বন্যাই ডেকে এনেছে প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নের জোয়ার। বন্যার জেরে ভিটে-মাটি ছাড়া মানুষগুলো কাজের সন্ধানে অন্য রাজ্যে যেতে বাধ্য হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এই মানুষগুলোর কষ্টের শেষ না থাকলেও পরবর্তীকালে এদের জীবনে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের এক জোয়ার নেমে এসেছে। যার জেরে সমগ্র এলাকার সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। এইভাবেই নদী যেমন একদিকে তার বন্যার জলে ভাসিয়ে নিয়েছে ঘরবাড়ি, চাষের ক্ষেত আবার অপরদিকে সেই বন্যার জলের জন্যই মানুষের জীবনে এসেছে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ঢল। আমার এই প্রবন্ধে আমি আলোচনা করবার চেষ্টা করব কিভাবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা প্রতিবছর বন্যায় ভাসলেও আর্থিকভাবে ঘাটাল মহকুমা সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হলো!

"এসো হাত লাগাই হাত লাগাই হাত লাগাই।
ভেঙে পড়া গ্রামে প্রাণের দুর্গ ফিরে বানাই।"[১]

৮৫ সালের বন্যা, প্রবল বৃষ্টিতে সমগ্র বাংলা এক ভয়াবহ ক্ষতির শিকার হয়। যেখানে মানুষের বাসস্থান গৃহপালিত পশু, ক্ষেতের ফসল, পরিবার-পরিজন ভেসে যায় নদীর জলে। সেই ভয়াবহ বন্যা থেকে রেহাই পাইনি ঘাটালের অধিবাসীরা। এই অবস্থায় খাবারের সন্ধানে অনেক ছেলে বেরিয়ে যায় অন্য রাজ্যে, অথবা বেরোতে বাধ্য হয়েছিল। কোভিড প্যান্ডেমিক-এর সময় একটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে রাজনীতির তথা অর্থনীতির ক্ষেত্রে, তাহল "পরিযায়ী শ্রমিক"। বিভিন্ন রাজ্যের "পরিযায়ী শ্রমিক" হয়ে ওঠে এই এলাকার শিশু থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ ছেলেগুলি। পরবর্তীকালে এদের হাত ধরে এই এলাকার অর্থনীতি ও সংস্কৃতির মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা যায়। এখনো পর্যন্ত ছেলেদের একটা ধারা হয়ে রয়েছে, মাধ্যমিকের পর বা তার আগে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এরা স্বর্ণশিল্পী হয়ে ওঠে। আমি যদি আমার জীবনটার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো আমার বয়সী যারা আমার সাথে পড়তো আমার গ্রামে প্রায় সকলেই আজ স্বর্ণশিল্পী।

ভৌগোলিক পরিবেশ ঃ—

একটু অন্যরকম। প্রধানত রূপনারায়ণ ও শিলাবতী এই দুটি নদী সমগ্র এলাকাকে ঘিরে রয়েছে। যার ফলে সুদীর্ঘ বাঁধ। যার বেশিরভাগই কাঁচা। বর্ষার সময় একটু বেশি বৃষ্টি হলেই নিয়ন্ত্রণ করতে ও সংরক্ষণ করতে বিশেষ অসুবিধার শিকার হতে হয় প্রশাসনকে। নদীর জল ধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত কম। ডিভিসি বা অন্যান্য জলাধার থেকে জল ছাড়লে এই নদীগুলোর ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। নদীগুলির বাঁধের উপর বিপুল পরিমাণ চাপের সৃষ্টি হয়। যার ফলে বর্ষার সময় এই এলাকায় বন্যা দেখা যায়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ করবার

জন্য ঘাটাল মাস্টার প্লান-এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্যে হল নদীগুলির জল ভাগ করে দিয়ে মূল নদীর চাপ কমিয়ে দেওয়া।

এই মহকুমা নদীমাতৃক হওয়ার কারণে প্রধানত কৃষিভিত্তিক জীবিকাই এই এলাকার প্রধান অর্থনৈতিক ভিত্তি হলেও, বর্তমান সময়ে স্বর্ণ শিল্পই এই এলাকার প্রধান জীবিকা। জনবসতির দিক থেকে বন্যার কারণে যাতে অসুবিধে না হয় সেই জন্য এখানকার বাড়িগুলি একটু অন্য রকম ভাবে বানানো। জমির উপর মাটি ফেলে উঁচু করে বাস্তু নির্মাণ করা হয়, তার ওপর বাড়ি তৈরি হয় যার ফলে বন্যা হলেও বাড়ির ভেতর জল যাতে না ঢোকে। যাদের আর্থিকভাবে সামর্থ্য আছে তারা বেশিরভাগ জমি দ্বিতল বা বহুতল বাড়ি নির্মাণ করেছে। প্রধানত গ্রাউন্ড ফ্লোরটি তারা হলঘর রূপে ফাঁকা রেখে দিয়েছে। যাতে বন্যার সময় কোনভাবেই অসুবিধে না হয়। সাধারণত বর্তমান সময়ে এই এলাকায় আর্থিক অবস্থা ভালো হওয়ার কারণে পাকা বাড়ি নির্মাণ শিল্প এই এলাকা জুড়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এই এলাকার ছেলেগুলি যেভাবে কাজের সন্ধানে অন্য রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে, সেই রকম বাড়ি নির্মাণ কাজের সাথেও যুক্ত হওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদ এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক ছেলে কাজের সন্ধানে ঘাটাল মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় এসেছে। এক সময় যে এলাকার ছেলেদের ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য করেছিল বন্যা, তাদেরই বাড়িঘর নির্মাণের জন্য তারাই আজ কর্মদাতায় পরিণত হয়েছে।

মহকুমার মধ্যে দাসপুর-১, দাসপুর-২, ঘাটাল, প্রধানত এই এলাকাগুলিতে বন্যার প্রভাব অত্যধিক। বর্তমান সময়ে সমগ্র মহকুমার মধ্যে এই তিনটি ব্লকেই আর্থিকভাবে উন্নতি সবথেকে বেশি। এই আর্থিক উন্নতির প্রধান কাণ্ডারী ভিন রাজ্যের অসংখ্য পরিযায়ী স্বর্ণশিল্পী। যাদের হাত ধরে এলাকায় আর্থিক উন্নয়নের জোয়ার হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে একসময় বন্যার তাড়নায় কাজের সন্ধানে বেরিয়ে গেলেও, পরবর্তী প্রজন্ম আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাকিয়ে এই পেশায় এগিয়ে আছে।

সোনার অলংকার যতটাই উজ্জ্বল, যতটাই তা ধারণ করলে আমাদের মাধুর্য গরিমা সৌন্দর্য বেড়ে ওঠে ঠিক উল্টোদিকে ততটাই শিল্পীদের কষ্টের জীবন। প্রথমত পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে গিয়ে তাদের বসবাস করতে হয়। যে ঘরে বসে তারা এই কাজগুলি করে তা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। একটি ১০ ফুট বাই ১০ ফুট ঘরে ১০ থেকে ১৫ জন বসে কাজ করছে। সূর্যের আলো ঢুকে না বললেই চলে, তারপর দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় বসে তাদের বিভিন্ন কাজ করতে হয়। কখনো সোনা গালানো থেকে শুরু করে মোম দেওয়া, সোনা পালিশ করা প্রভৃতি। দিনে প্রায় ১৫-১৬ ঘন্টা এক জায়গায় বসে তাদের এই কাজগুলি করতে হয়।

অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন এইভাবে কাজ করবার ফলে তাদের শারীরিক বিভিন্ন সমস্যাও দেখা দেয়। প্রধানত এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার ফলে স্পাইনাল কর্ডের বিভিন্ন সমস্যা, চোখে ছানি পড়া, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া। দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করবার ফলে জল ঠিক মতো খাওয়া হয় না, যার ফলে জন্ডিস, কিডনিতে পাথর পড়া, ওবেসিটি প্রকৃতি রোগের শিকার হতে হয়। দৃষ্টিশক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সূক্ষ্ম কাজগুলি তাদের করতে হয় তাই তাদের চোখ তারা দীর্ঘদিন ঠিক রাখতে পারে না। খুব অল্পদিনের

মধ্যেই চোখের বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এরই সাথে বেশিরভাগ যুবক দীর্ঘদিন নিজের পরিবার থেকে দূরে থাকে। যার ফলে নিষিদ্ধ পল্লীতে যাতায়াত বাড়ে; ফলে HIV-র মতো মারণ ব্যাধিরও শিকার হতে হয় তাদের। ভারতবর্ষের এইচ আই ভি তালিকায় ঘাটাল মহকুমা রেড জোনের অন্তর্গত।

সংস্কৃতি বৈচিত্র্য ঃ—

এই এলাকার মানুষজন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের স্বর্ণশিল্পের সাথে যুক্ত থাকে। সেই কারণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের সংস্কৃতির এই এলাকায় সংমিশ্রণ দেখা যায়। অনেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বসবাস করে, বছরের এক বা একাধিকবার ঘাটাল মহকুমায় তাদের নিজের জন্ম ভিটেয় ফিরে আসে। যার ফলে তারা যখন আসে ওই এলাকায় তাদের সাথে ভিন্ন রাজ্যের সংস্কৃতির মিশ্রণ দেখা যায়। এরই সাথে তাদের বাড়ি বানানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘটতে থাকে। যার ফলে ঘাটাল মহকুমার এই তিনটি ব্লকে কসমো কালচার দেখা যায়। যে ছেলেগুলি এক সময় বন্যার তাড়নায় ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল, প্রথাগত শিক্ষায় নিজেদের শিক্ষিত করতে পারেনি তারা কিন্তু তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার দিকে অগ্রসর হতে বিশেষ উৎসাহিত করে। বিভিন্ন উচ্চশিক্ষার সাথে এই মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের ছেলেরা বিশেষভাবে যুক্ত আছে। এই ব্যয়বহুল উচ্চশিক্ষা গুলি যারা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের পরিবারগুলি বেশিরভাগই স্বর্ণ শিল্পের সাথে যুক্ত। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে ঘাটাল মহকুমার দুর্গাপুজো বিশেষ বিখ্যাত। যার মধ্য চাঁইপাট, সোনাখালি, পাঁচবেড়িয়া, লঙ্কাগড়, রাধাকান্তপুর, আর এইসব দুর্গাপুজো গুলি বেশির ভাগই ভিন্ন রাজ্যের স্বর্ণ শিল্পীদের আর্থিক সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই কমিটিগুলির পুজোর বাজেট লক্ষাধিক টাকা ছাড়িয়ে যায়। এছাড়াও এই এলাকাগুলিতে সারা বছরই এই স্বর্ণ শিল্পীদের অর্থানুকূল্যে বিভিন্ন পূজা, উৎসব, মেলা লেগেই থাকে।

সামগ্রিকভাবে দেখলাম যে, বন্যা একটা এলাকার নতুন জীবিকার সৃষ্টি করল। সেই জীবিকার হাত ধরে কয়েক প্রজন্ম নিজেদেরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করল। এলাকার আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেল তারই সাথে শিক্ষা, সংস্কৃতির একটা নতুন ধারা গড়ে উঠলো। এক সময় যেই এলাকা আর্থিক সাংস্কৃতিক সব দিক দিয়ে পিছিয়ে ছিল তারাই আজ প্রথম সারির দিকে এগিয়ে এলো। যদিও ২০২০ সাল বিশ্বব্যাপী যে মহামারী সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে সমগ্র বিশ্ব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাদ যায়নি ঘাটাল মহকুমার এই স্বর্ণ শিল্পীগুলির জীবন। ভারত যখন লকডাউনের সময় দোকানদানি সমস্ত কিছু বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল, তখন পরিযায়ী পাখির মতো পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ফিরে এসেছিল এই শিল্পীরাও। সেই সময় এই গ্রামগুলি মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। কর্মসূত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে তারা বসবাস করে, একসাথে বাড়ি আসা হয় না কারোরই, ছোটবেলার সেই খেলার সাথীদের সাথে দেখা হল এই সময়। মিলনক্ষেত্রে পরিণত হলো এই প্রায় এক থেকে দেড় বছর। বিভিন্নভাবে আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, দীর্ঘদিন কাজ না থাকার ফলে। বিভিন্নভাবে গ্রামের বিভিন্ন কাজের সাথে তারা যুক্ত থেকে কোনোভাবে এই সময়গুলি কাটিয়ে পুরনো ছন্দে ফিরে গেছে আবার সেই স্বর্ণ শিল্পীরা।

আদিবাসীদের পূজাপার্বণ

প্রসেনজিৎ সরকার (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

নতুনপাড়া গ্রামে কয়েক শ আদিবাসীর বসবাস। পাশ্ববর্তী অঞ্চলের তুলনায় তাদের জীবনযাত্রা একটু ভিন্ন ধরনের। আদিবাসীদের পূজা পার্বণ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ভিন্ন স্বাদের, একটু চাক্ষুস না করলে বোঝা অসম্ভব। মাটির মতো মানুষজন, সহজেই ভিন্ন ধর্মের মানুষ গেলেও তাদের সঙ্গে একেবারে মিশে যাওয়া যায়। আদিবাসীদের মূলত যে পার্বণ গুলো হয় সেগুলি হল নববর্ষ, দুর্গোৎসব, টুসু পূজা, চড়ক, বড় পাহাড় পূজা ইত্যাদি। তবে এর মধ্যে অবশ্যই বড় পূজা হল টুসু পূজা। এর এক বিশেষ নিদর্শন আছে এবং এর মাহাত্ম্য অনেকখানি। এরা বাংলা বছরের শেষ দিনকে এবং বছরের প্রথম দিনকে বিশেষভাবে পূজা অর্চনা করে থাকে। বছরের শেষ দিন চড়ক মেলা নামে পরিচিত হয়। সেই দিন বাড়িতে বাড়িতে নিরামিষ খাওয়া হয়। লোক মুখে শোনা যায়, ওই দিন আম খাওয়ার শুভ দিন। সেই সঙ্গে ভাজা গমের গুড়ো যাকে আমরা ছাতু বলে জানি, সেটা তাদের প্রিয় খাবার হয়ে ওঠে। এমন গরীব মানুষ এই ছাতু খেয়ে বছরের শেষ দিন ও প্রথম দিন উদ্‌যাপন করে থাকে। তারপর আসে দুর্গোৎসব। তবে এই পূজা খুব একটা আনন্দমুখর করে তুলতে পারে না। কারণ দিন-দুঃখী মানুষের কাছে অর্থ একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তবে বর্তমানে সমাজ পরিবর্তনের ফলে সেই পুজোও হচ্ছে। আদিবাসীদের সব থেকে বড় উৎসব টুসু পূজা। পৌষ মাসের শেষ দিনে এই পূজা পালিত হয়। বাড়িতে বাড়িতে নতুন ধান ওঠে এবং এই ধান ভাঙিয়ে যে নতুন চাল তৈরি হয় তা দিয়ে মাকে নিবেদন করা হয়, যা নবান্ন উৎসব নামে পরিচিত। ঢেঁকিতে চাল ভাঙিয়ে গুঁড়ি করা হয় এবং সেই দিয়ে নানা ধরনের পিঠে-পুলি তৈরি করা হয়। সেগুলি মাকে নিবেদন করা হয়। সেই সঙ্গে মাকে উৎসর্গ করার জন্য বিভিন্ন টুসু গান করা হয়ে থাকে। এই পূজা নিজে চাক্ষুস করলে মন জুড়িয়ে যাবে।

এই টুসু পূজার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আদিবাসীদের মোরগ লড়াই। এটা এক সুন্দরতম আকর্ষণ। কালীপূজা কার্তিক মাসে হয়ে যাওয়ার পর মোরগ লড়াইয়ের আকর্ষণ বেড়ে যায়। দুটি মোরগের পায়ে ছুরি বেঁধে দেওয়া হয়, যে মোরগ মরে যায় বা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়, সেই মোরগ হেরে যায়। আর যে বীর যোদ্ধা দাঁড়িয়ে থাকে; সেই মোরগ জিতে যায়। এই লড়াই আমাদের এখানে সপ্তাহে বৃহস্পতিবার হয়। মুন্সীঘেরী নামক পাশের গ্রামে প্রতি বুধবার করে লড়াই হয়। এই গ্রামে আবার সপ্তাহে এখনো দু-দিন ধরে হাট বসে বিকেলবেলা করে, প্রতি বুধবার ও শনিবার। এই ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। মোরগ লড়াইয়ের একটি জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়। পৌষ পার্বণের শেষ দিনের পর মাঘ মাস পড়ে। এই মাঘ মাসের প্রথম দুই দিন বড় মোরগ পার্বণ নামে পরিচিত। বড় লড়াইয়ের যে এলাকায় শেষ লড়াই হয় তাকে আমরা আদিবাসীদের ভাষায় 'বাউড়ি' বলে থাকি। এখানে অদ্ভুত এক জিনিস লক্ষ্য করা যায়। কেউ লড়াইয়ে হারে,

কেউ জেতে, কিন্তু তাদের মধ্যে হিংসার কোনো লক্ষণ বা দুঃখ দেখা যায় না। তারা আনন্দ করার জন্য হাড়িয়া সুরা পান করে থাকে। বড় মোরগ লড়াইয়ে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যোগ স্থাপন লক্ষ্য করা যায়, যা এক বিরাট আনন্দ মুহূর্ত।

তবে বর্তমানে এই পূজাকে কেন্দ্র করে যে মোরগ লড়াই দেখা যায়; তা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে একাত্মতা গড়ে তোলে। হিন্দু-মুসলিম একত্রে এই পার্বণে মিলিত হয়।

আর একটি বিশেষ পূজা হল গ্রাম পূজা। গ্রামের মানুষদের রক্ষার জন্য এই পূজা করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর, বিভিন্ন বংশের মানুষ মিলিত হয়ে এই পূজা করে। এই পূজায় জলে চাল ভিজিয়ে দুধ-কলা মিশিয়ে মা-কে নিবেদন করা হয়। আর একটি পূজা হল বড় পাহাড় পূজা। এই পূজা সাধারণত বংশ ভিত্তিক করা হয়ে থাকে। পুজোতে মুরগী ও ছাগল বলি দেওয়া হয়ে থাকে। সেগুলি দিয়ে খিচুড়ি করা হয় এবং প্রসাদ দেওয়া হয়।

এইভাবে প্রত্যেকটি পুজো আদিবাসীরা আনন্দের সহিত পালন করে থাকে। এখনো পূর্বপুরুষদের প্রচলিত নীতি অব্যাহত রয়েছে।

জলেতে ইচ্ছে করেই পড়, আর ঠেলেই ফেলে দিক — কাপড় ভিজবেই। নিত্য ধ্যান করবে। কাঁচা মন কিনা! ধ্যান করতে করতে মন স্থির হয়ে যাবে। সর্বদা বিচার করবে, যে বস্তুতে মন যাচ্ছে, তা অনিত্য চিন্তা করে ভগবানকে মন সমর্পণ করবে। একটি লোক মাছ ধরছিল — পাশে বাজনা বাজিয়ে বর যাচ্ছে, কিন্তু তার ফাতনার দিকেই দৃষ্টি।

— শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

সোহরায় পরব

শ্যাম হেমরম (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

সোহরায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রধান উৎসব। সোহরায় উৎসব হয়ে থাকে কার্তিক মাসে। তাই সাঁওতালি বর্ষপঞ্জিতে কার্তিক মাসকে সোহরায় বঙ্গা বলে। এই উৎসবে সাঁওতালদের এক মনোযোগে এই পরব পালনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই উৎসবে গৃহপালিত পশু গোরু, মোষ বিশেষত এই দুই প্রাণীর মঙ্গল কামনা করা হয় দেবতা মারাং বুরুর কাছে।

পালন রীতি ঃ—

বিভিন্ন বই ও বয়স্কদের কাছ থেকে এবং প্রাচীন গান থেকে জানা যায় সাঁওতাল সমাজে পাঁচটি পর্বের উপর পাঁচ দিন ধরে পালন করা হয়। এখন বেশিরভাগ গ্রাম তিনটি দিনে পাঁচটি পর্ব পালন করে থাকে। এই পর্বগুলি হল — ১) উম, ২) দাকা, ৩) খুন্টাউ, ৪) জালে, ৫) সাকরাত।

উম ঃ—

সোহরায়ের প্রথম দিনকে বলা হয় 'উম' মাহা। যার অর্থ শুচিকরণ বা পবিত্র দিন। এই দিনে ঘরবাড়ি ও পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার করার কাজ সমাপ্ত হয়। এই দিনে গ্রামের বাইরে যে কোনো জায়গায় অস্থায়ী পূজার স্থান নির্ধারণ করা হয়। যাকে বলা হয় 'গট' বা গট টাঁড়ি। নায়কে (ব্রাহ্মণ) সহ গ্রামের সকলে স্নান করে নতুন পোশাক পরে গট টাঁড়িতে যায়। সেখানে নায়কে সিঁদুর, শালপাতা, হাঁড়িয়া রসি দিয়ে পূজা করেন এবং গ্রামের সব বাড়ি থেকে নিজ নিজ মুরগি দেবতার নামে উৎসর্গ করে। গ্রামের সকল মানুষ ও গবাদি পশু এত দিন সুস্থ ছিল সে জন্য নায়কে মারাং বুরুকে (প্রধান দেবতা) সহ অন্যান্য দেবতাদের ধন্যবাদ জানায় এবং ভবিষ্যতেও যেন এইভাবে সবাই ভালো থাকে তার জন্যও কামনা করেন।

তারপর কুড়ীম নায়কে (সহকারী পুরোহিত) একটু পৃথক জায়গায় প্রার্থনা করেন গ্রামে যেন কোনো রোগ, মহামারী বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ না আসে। সেই সাথে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত সাঁওতাল সহ সকল মানুষের মঙ্গল কামনা করেন। তারপর উৎসর্গ করা মুরগি দিয়ে পোলাও তৈরী করা হয় গ্রামের সকলের জন্য। দুপুরে খাওয়া হয় সেখানেই। এরপর বাইরে চরানো গ্রামের গবাদি পশু নিয়ে আসা হয় পূজার স্থানে। পূজার জন্য ব্যবহৃত শালপাতা যে গবাদি পশু খাবে তাকে মাথায় সিঁদুর দেওয়া হয়, তার মালিককে ভাগ্যবান মনে করা হয়। সেই খুশিতে মালিক পরের বছরে সোহরায়ে বড়ো কোনো অনুদান দেওয়ার কথা বলেন। তার পর সবাই নাচ-গান করতে করতে গ্রামে ফিরে আসে। সব শেষে বাড়িতে এসে প্রত্যেক বাড়ির গৃহপালিত পশুর মালিক বাড়ির ভেতরে মারাং বুরু ও পরিবারে মৃত ব্যক্তিদের আত্মার উদ্দেশ্যে তাং হাণ্ডি (বিশেষ

ধরণের পানীয়) উৎসর্গ করে এবং তারাও যেন তাদের জগতে আনন্দে থাকে এই কামনা করে। তারপর অবশিষ্ট হাণ্ডি পরিবারের কেউ খেলে তাকে দেওয়া হয় নাহলে পাড়ার লোককে দেওয়া হয়।

দাকা ঃ—

সোহরায়ের দ্বিতীয় দিনকে বলা হয় বঙ্গা মাহা (দেবতা দিবস) ও দাকা মাহা (ভোজ দিবস)। এই দিনে প্রতি বাড়িতেই আত্মীয় চলে আসে। এই দিনে বিশেষ গুরুত্ব পান মেয়ে-জামাই। তাকে পা ধুয়ে বরণ করা হয় এবং নতুন কাপড় দেওয়া হয়। পা ধোয়ার দায়িত্ব থাকে শালীদের। এই দিনে প্রচুর খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়। বিকাল-সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত নাচ-গান হয়।

খুন্টাউ ঃ—

সোহরায়ের তৃতীয় দিনকে বলা হয় 'খুন্টাউ'। যার অর্থ গোবাদি পশুকে ঘাস খাওয়ানোর জন্য বাইরে বেঁধে রাখা। এর আগের দিন ময়দা পানি দিয়ে গোয়াল ঘরের দুয়ারে সাঁওতালদের পদবী ভেদে বিভিন্ন নক্সা আঁকা হয়। এই দিনে সকালে গবাদি পশুর মাথায় শিঙে ধানের শিষের তৈরী মালার মত বেঁধে দেওয়া হয়। তার পর নায়কে, জগমাঝি ও অন্যান্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিসহ অনেকে বাড়ি গিয়ে গোয়াল ঘরের সামনে গবাদি পশুর মঙ্গাল কামনা করে গানের মাধ্যমে। প্রতি বাড়িতে তাদের আপ্যায়ন করা হয়। এই দিনে বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধামসা, মাদল বাজিয়ে গোরু ও মোষকে নাচানো হয়। জগমাঝির বাড়ি থেকে শুরু হয় এবং নাচ-গান জগমাঝির বাড়িতে গিয়ে শেষ হয়।

জালে ঃ—

সোহরায়ের চতুর্থ দিনকে বলা হয় 'জালে'। যার অর্থ তৃপ্তি করে খাওয়া। এই দিনে সবাই সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাণ্ডি পান করে। এই দিন ও বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জগমাঝির বাড়ি থেকে শুরু করে গ্রামের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত নাচ-গান হয়। তবে জগমাঝির বাড়িতে না গিয়ে মাঝি (গ্রাম প্রধান)-এর বাড়িতে গিয়ে সমাপ্ত করা হয়। মাঝির বাড়িতে পিঠা ও মুড়ি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। যারা হাণ্ডি পান করে তাদের হাণ্ডি দেওয়া হয়।

সাকরাত ঃ—

সাকরাতকে ভিন্ন উৎসব হিসাবেও পালন করা হয়ে থাকে। তবে যে সব জায়গায় কার্তিক মাসের পরিবর্তে পৌষ মাসে সোহরায় পালন করা হয় সেখানে এই চারটি দিনের সাথে আর একটি দিন যুক্ত করা হয়। সেটা হল স্যাকরাত। যার অর্থ সমাপ্তি বা সংক্রান্তি। এই সাকরাত উৎসবের মাধ্যমে সাঁওতালি বর্ষ সমাপ্ত হয়। এই দিনে গ্রামের পুরুষেরা শিকার করতে যায়। শিকার থেকে ফিরে এসে নাচ-গানের মাধ্যমে তাদের গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর হাত, পা ধুয়ে যে যার বাড়ি যায়। তারপর তীর-ধনুক নিয়ে বেঝা তুঞ্চ করতে যায়। এর অর্থ একটা কলাগাছকে অশুভ হিসাবে পুঁতে দেওয়া হয়, তাকে উদ্দেশ্য করে তীর ছোঁড়া হয়। যে

কলা গাছটিকে তীরবিদ্ধ করতে পারবে তাকে জগমাঝি কাঁধে করে গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে আসে। কলা গাছটিকে বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্রের ভিত্তিতে কেটে সেগুলিকে বাজাতে বাজাতে গ্রামে দায়িত্ব প্রাপ্ত নায়কে, গড়েৎ, পারাণিক, জগমাঝির বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

সব শেষে বলা যায় সোহরায় উৎসবের গুরুত্ব পূর্ণ দিক হলো এই উৎসব শুধু মানুষের অংশগ্রহণে পূর্ণতা লাভ করেনি। এখানে গবাদি পশুর জন্যও একটি অংশ রাখা হয়েছে। কেননা এই গবাদি পশুর মাধ্যমে চাষ-আবাদ থেকে শুরু করে একটি পরিবারের অনেক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। আপদ-বিপদ থেকে গবাদি পশুর বিনিময়ে অনেক সময় মানুষ মুক্তি পায়। সোহরায় আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় শুধু মানুষ নয়; সকল প্রাণীই প্রকৃতির সন্তান। তাই সব আনন্দই সবার মাঝে ভাগ করা উচিত।

মুখ

জ্যোতির্ময় মাইতি (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

আমার জানলা দিয়ে তারাটাকে আজ খুব বড়ো মনে হয়।
মনে হয় মর্ত্যভূমিকে স্পর্শ করে আমার কাছে দু'দণ্ড বসতে চায়। বলতে চায় জীবনের নানা গল্প।
পুকুরের জলে প্রতিবিম্বিত তারা মর্ত্যভূমির গন্ধ নিচ্ছে মেখে।
বলছে আমায় জগতের প্রেক্ষাগৃহে দীর্ঘস্থায়ী বলে কিছু নেই
জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সুখ-দুঃখ সব কিছু ক্ষণিক। পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক কিন্তু ক্ষণিক।

আমি কথা বলতে চাই। চিৎকার করে উঠতে চাই।
চিৎকার করার প্রাক মুহূর্তে আমি বুঝতে পারি আমার গলা শুকিয়ে গেছে, জিভ সংকুচিত হয়ে আসছে,
ঠোঁট দুটো কে যেন আঠা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে।
গলার ওপর দুটো হাত আমার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করেছে।
আমি শুধু কয়েকবার কঁকিয়ে উঠেছি, চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল পড়েছে।

সকালে চোখের ওপর সূর্যের আলো।
আড়ষ্ট দুটো চোখ রাতের সমীকরণ খুঁজতে চায়।
আমার বুকের ওপর দুটো হাত
আমার হাত দুটো অন্য এক মুখ খুঁজতে চায়।

ঐতিহ্যের চন্দননগর

অর্ণব বসাক (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

সরস্বতীর পূর্বে ও ভাগীরথীর পশ্চিমে অর্থাৎ সরস্বতী ভাগীরথীর মধ্যভাগে অবস্থিত এই চন্দননগর। মনে করা হয় ভাগীরথী বা গঙ্গার চাঁদের মতো বাঁকের থেকেই এই শহরের নাম হয়ে উঠেছে চন্দননগর। এই শহরের ইতিহাস বহু প্রাচীনকাল থেকেই যথেষ্ট সমৃদ্ধ। বহু শক্তি এই শহরে তাদের শাসনকালে আধিপত্য চালিয়েছে, শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ বছর এই শহর ছিল ফরাসিদের অধীনে।

চন্দননগরের ইতিহাস ঃ—

খলিসানি, বড়ো কিষাণগঞ্জ এবং গোন্দলপাড়াকে কেন্দ্র করে চন্দননগরের নগরায়ণ শুরু হয়। চন্দননগর 1673 সালে ফরাসি উপনিবেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, হুগলি নদীর দক্ষিণ তীরে একটি বাণিজ্য পোস্ট স্থাপনের জন্য, তৎকালীন বাংলার নবাব ইব্রাহিম খানের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে।

এটি 1688 সালে একটি স্থায়ী ফরাসি বন্দোবস্তে পরিণত হয়। 1730 সালে জোসেফ ফ্রাঙ্কোইস ডুপ্লেক্স শহরের গভর্নর নিযুক্ত হন। 1756 সালে ফ্রান্স এবং গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং 23 মার্চ 1757 সালে ব্রিটিশ নৌবাহিনী চন্দননগর দখল করে। 1763 সালে চন্দননগর ফরাসিদের কাছে পুনরুদ্ধার করা হয়, কিন্তু 1794 সালে ব্রিটিশরা পুনরায় দখল করে। শহরটি 1816 সালে ফ্রান্সের কাছে ফিরে আসে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের একটি 3 বর্গ মাইল (7.8 কিমি 2) ছিটমহল। পণ্ডিচেরিতে গর্ভনর জেনারেলের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে 1950 সাল পর্যন্ত এটি ফরাসি ভারতের অংশ হিসাবে শাসিত হয়েছিল, যদিও ভারত 1947 সালে ব্রিটেন থেকে স্বাধীন হয়েছিল।

চন্দননগর স্ট্র্যান্ড ঃ—

চন্দননগর স্ট্র্যান্ড গঙ্গা নদীর তীরে একটি সুন্দর পর্যটন স্পট। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় 2 কিমি এবং প্রস্থে 7 মিটার এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব সহ অনেক ভবন স্থানটিকে ঘিরে রয়েছে। এটি এমন একটি জায়গা যেখানে লোকেরা হাঁটতে এবং দূর জলে পালতোলা নৌকার দিকে তাকাতে ভালোবাসে। এটি নদীর সর্বোত্তম সজ্জিত তীর, তার পুরো প্রসারিত বরাবর। এখানে একটি ধ্যান কেন্দ্রও তৈরি করা হয়েছে।

চন্দননগর মিউজিয়াম এবং ইন্দো-ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট ঃ—

চন্দননগর জাদুঘর এবং ইন্দো-ফরাসি ইনস্টিটিউট একটি ইন্দো-ফরাসি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং যাদুঘর। এটি 19 শতকে তৎকালীন ফরাসি প্রধানমন্ত্রী পম্পিদ্রে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেন্দ্রে বিভিন্ন গ্যালারি রয়েছে, যা ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ফরাসি আসবাবপত্র,

ফরাসি পর্যায়ক্রমিক প্রশাসনের পাশাপাশি ভারতীয় শিল্প ও কারুশিল্পের জন্য নিবেদিত। আর্ট গ্যালারি এবং জাদুঘরটি 1956 সালে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

মিউজিয়ামে গুপ্ত আমল থেকে জেলার প্রত্নতাত্বিক আবিষ্কার সহ চন্দননগরের স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কিত প্রদর্শনী রয়েছে। এছাড়াও, লাইব্রেরিতে ভারতে ফরাসি প্রশাসন সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে।

ব্যান্ডেল চার্চ ঃ—

ব্যাসিলিকা অফ দ্য হলি রোজারি যা ব্যান্ডেল চার্চ নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম খ্রিস্টান চার্চগুলির মধ্যে একটি। ব্যান্ডেল চার্চ হল একটি রোমান ক্যাথলিক চার্চ যা হুগলি জেলার ব্যান্ডেলে অবস্থিত। 25 নভেম্বর, 1988-এ, পোপ জন পল দ্বিতীয় অভয়ারণ্যটিকে একটি ছোট বেসিলিকা ঘোষণা করেছিলেন। ব্যান্ডেল, (নামটি এসেছে বাংলা শব্দ "বন্দর" থেকে। পর্তুগিজ ও মুঘলদের সময়ে হুগলি বন্দর ছিল বলে মনে হয়। পর্তুগিজ বসতির একমাত্র ধ্বংসাবশেষ হল চার্চ (ব্যাসিলিকা) এবং মঠ। বর্তমান গির্জা এবং মঠটি 1660 সালে গোমেজ দে সোটো দ্বারা নির্মিত বলে বলা হয় যাতে মঠের পূর্ব গেটের উপরে 1599 খ্রিস্টাব্দের পুরানো গির্জার মূল পাথর রয়েছে। গির্জার মাঝখানে "ওয়ান লেডি অফ হ্যাপি ওয়ায়েজ"-এর মূর্তি রয়েছে। গির্জাটিতে তিনটি বেদী, একটি ছোট অঙ্গ এবং বেশ কয়েকটি সমাধির পাথর রয়েছে।

হুগলি ইমামবাড়া ঃ—

ইমামবাড়া, হাজী মোহাম্মদ মহসিন দ্বারা নির্মিত, চিনসুরাতে গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। ভবনটির নির্মাণকাজ 1841 সালে শুরু হয় এবং 1861 সালে সম্পন্ন হয়। দোতলা ভবনটিতে বেশ কয়েকটি কক্ষ রয়েছে এবং এর একটি প্রশস্ত প্রবেশপথ রয়েছে, যার প্রধান গেট দুটি 80 ফুট লম্বা টাওয়ার এবং তাদের মধ্যে একটি বিশাল ঘড়ির টাওয়ার রয়েছে।

দেওয়ালগুলি পবিত্র কোরাণের বাণী দ্বারা সজ্জিত এবং মার্বেল, মোমবাতি ও লণ্ঠন দ্বারা সজ্জিত। মসজিদটি ভবনের উত্তরে অবস্থিত এবং দক্ষিণে মোহাম্মদ মহসিন ও তার আত্মীয়দের কবর রয়েছে।

ডাচ কবরস্থান ঃ—

ডাচ কবরস্থান একটি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া (এ.এস.আই) সুরক্ষিত স্থান। কবরস্থানে প্রাচীন গাছের ছায়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কবরের একটি ভাণ্ডার রয়েছে। প্রাচীনতম তারিখটি 1743 সালে এবং নতুনটি 1840 সালে স্থাপন করা হয়েছিল।

লুই টেলফের্ট, বাংলায় VOC-এর তৎকালীন পরিচালক দ্বারা নির্মিত, কবরস্থানটি 18-19 শতকে সক্রিয় ছিল এবং 1743 সালের মধ্যে মারা যাওয়া ডাচ নাগরিকদের প্রায় 45টি কবর রয়েছে। প্রাচীনতম সমাধিটি স্যার কর্নেলিয়াস জঙ্গোর, যিনি 1743 সালে চিনসুরাতে মারা যান। এখানে সমাহিত অন্যান্য বিশিষ্ট

ব্যক্তিরা হলেন ভিওসি-র একজন উচ্চ কর্মকর্তা ড্যানিয়েল ওভারবেক, গ্রেগরিয়স হারক্লটস এবং অন্য ভিওসি পরিচালক জর্জ ভার্নেট। শেষোক্তর সমাধিতে কোনো শিলালিপি নেই।

চিনসুরা ক্লক টাওয়ার ঃ—

এই 19 শতকের গথিক টাওয়ার, রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের স্মরণে ব্রিটিশরা আমদানি করেছিল, চিনসুরার আইকনিক ল্যান্ডমার্ক। ঢালাই লোহায় কারুকাজ করা, এটির ঘড়ি কার্যকর অবস্থায়, ঘড়ির মোড় যা জনপ্রিয়ভাবে পরিচিত, চারটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

EDWARDVS VII DEI GRA BRITT OMN REX যা সপ্তম এডওয়ার্ডের ল্যাটিন সংক্ষেপ, ঈশ্বরের কৃপায়, অল ব্রিটেনের রাজা, বিশ্বাসের রক্ষাকারী। এগুলি এমন শিলালিপি যা চিনসুরার ছোট ঘড়ির টাওয়ারটি অতিক্রম করার সময় লোকেরা প্রায়শই লক্ষ্য করে না। চার-পয়েন্ট ক্রসিং-এ এর উপস্থিতির কারণে বেশিরভাগই কেবল এটিকে "ঘোড়ির মোড়" (ক্লক ক্রসিং) বলে।

সুজানা আন্না মারিয়ার সমাধি ঃ—

চিনসুরা বা চুচুড়া শহরের ঠিক বাইরে, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে (GT. Rd.) সুসানা আনা মারিয়ার মন্দির শৈলীর কবর। সুজানা আনা মারিয়া একজন ডাচ মহিলা ছিলেন মিস্টার ইয়েটস নামে একজন ইংরেজের সাথে বিবাহিত, যদিও মহিলা বা তার স্বামী সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায়নি। 1809 সালে নির্মিত, অষ্টভুজাকার কাঠামোটি ইন্দো-ডাচ স্থাপত্যের একটি আদর্শ উদাহরণ। খিলানযুক্ত গেটওয়ে এবং সরু স্তম্ভ সহ দোতলা কাঠামোটি একটি গম্বুজ দ্বারা মুকুটযুক্ত। সমাধিটিতে কোনো এপিটাফ নেই তবে গম্বুজের ড্রামে সুজানা আনা মারিয়া নামটি খোদাই করা আছে।

জগদ্ধাত্রী পূজা ঃ—

জগদ্ধাত্রী পূজা এই অঞ্চলের একটি প্রধান সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই সংস্কৃতি এমনকি কলকাতার দুর্গাপূজার মর্যাদায়ও উন্নীত হয়েছিল। স্পষ্টতই এই পূজা এখানকার হিন্দু রীতির প্রতিনিধিত্ব করে। এই পুজোর স্বতন্ত্রতা হল প্রতিমার উচ্চতা এবং জাঁকজমকপূর্ণ ও আকর্ষণীয় আলোকসজ্জা।

মকর সংক্রান্তি ছিল সমান গুরুত্বের আরেকটি উৎসব। যারা ত্রিবেণী সঙ্গমে ডুব দেয় তাদের প্রার্থনা পূর্ণ হয় বলে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল।

প্রিন্টিং মেশিন প্রথম 1778 সালে এই জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রথম বাংলা বই (বাংলা ভাষার ব্যাকরণের বাংলা সংস্করণ) এখানে মুদ্রিত হয়েছিল। এইভাবে জেলাটি অনেকগুলি প্রথম স্থাপনার দর্শক, তাই ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তদুপরি হুগলির ভবনগুলি প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের জীবন্ত মূর্ত প্রতীক।

জগদ্ধাত্রী পুজোর ইতিহাস ঃ—

চন্দননগর হুগলীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর। আর চন্দননগর মানেই জলভরা সন্দেশ আর জগদ্ধাত্রী পুজো। আগেই উল্লিখিত হয়েছে, এক কালে চন্দননগর ছিল ফরাসীদের অধীনে, আর ফরাসডাঙ্গা ছিল ব্রিটিশ কলকাতার নব্য বাঙালি বাবুদের কাছে 'উইকএন্ডে বিদেশ ভ্রমণের' সেরা ঠিকানা। সে দিন আজ আর নেই। তবে এককালের ফরাসী আভিজাত্য ও রেড ওয়াইনের আকর্ষণের বদলে স্থান করে নিয়েছে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর আকর্ষণ, যার টানে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটে আসেন চন্দননগর শহরে।

শাক্ত-তান্ত্রিক দেবী জগদ্ধাত্রী সম্পর্কে চতুর্দশ শতকে মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি তাঁর 'ব্রতকালবিবেক' গ্রন্থে বলেছেন,

"কার্তিকেই মল পক্ষাস্য ত্রেতাদৌ নবমেয় হনি
পূজয়েত্তাং জগদ্ধাত্রীং সিংহপৃষ্ঠে নিষেদুষীম।।"

অর্থাৎ, কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতেই জগদ্ধাত্রী দেবীর পুজো হয়। বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্রে জগদ্ধাত্রী পূজার উল্লেখ আছে। মার্কন্ডেয় পুরাণে দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী অভিন্ন দেবী। "জগদ্ধাত্রী দুর্গায় নমঃ" মন্ত্রে জগদ্ধাত্রী পূজিতা হন। জগতকে যিনি ধারণ করে আছেন তিনিই জগদ্ধাত্রী। জগদ্ধাত্রী চতুর্ভুজা। চারটি হাতে শঙ্খ, চক্র, ধনু ও বাণ। দেবী সিংহবাহিনী, রক্তাম্বরা, গাত্র বর্ণ উদিত সূর্যের আভার মত, গলায় ঝুলছে নাগযজ্ঞোপবীত। পুরাণে আছে, দেবী বধ করেছিলেন করীন্দ্রাসুরকে। অসুর এখানে হস্তী। এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের চমৎকার এক উক্তি, "মানুষের চঞ্চল মন ক্ষ্যাপাটে হাতির মতন। হাতির বিনাশ মানে চঞ্চল মনের বিনাশ।" কেউ কেউ বলেন গুপ্তযুগের মুদ্রাতেও সিংহবাহিনী দেবী জগদ্ধাত্রীর চিত্র খোদিত আছে। তবে সেই সিংহবাহিনী দেবীই জগদ্ধাত্রী কিনা সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। হুগলীর জগদ্ধাত্রী পুজো বললে প্রথমেই মনে পড়ে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর কথা। একথা বললে অত্যুক্তি হয় না, যে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীর ইতিহাসের বুনিয়াদ মূলত মৌখিক বর্ণনার আখরে নির্মিত। সাল তারিখের বিতর্ক এখানে অনর্থক। চন্দননগর তখন প্রধান বন্দর, হুগলীর পরেই। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে হুগলী ছিল মূল বন্দর। বাংলায় তখন পর্তুগীজদের রমরমা। সরস্বতীর নদীখাত শুকিয়ে যাওয়ার পরেই পর্তুগীজরা চলে আসে হুগলীতে। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে মুঘল বাদশাহ শাহজাহানের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুগলী থেকে বিদায় নেয় পর্তুগীজরা। ধীরে ধীরে হুগলী নদী ব্যবসা, বাণিজ্য ও পরিবহনের মূল মাধ্যম হয়ে ওঠে। ভারতের ঔপনিবেশিক ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের যবনিকা পতন সেখানেই। পর্তুগীজদের যাওয়ার সাথেই তিনটি ঔপনিবেশিক শক্তি হুগলী নদীর তীরে বাণিজ্য তরী ভেড়ায়। চুঁচুড়ায় ওলন্দাজ, হুগলীতে ব্রিটিশ এবং চন্দননগরে ফরাসীরা। শুরু হয় ঔপনিবেশিক শক্তি আস্ফালনের পরবর্তী অধ্যায়। ফরাসীদের বাণিজ্যতরী নেহাতই পাকেচক্রে নিকটবর্তী ওড়িশার উপকূলে এসে পৌঁছায় (১৬৭৩), তখনও চন্দননগর নামকরণ হয়নি। ফরাসীদের এলাকা ফরাসডাঙা পন্ডিচেরীর অধীনে আসে ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে। ততদিনে ফরাসীরা কুঠি তৈরীর ফরমান আদায় করে নিয়েছে তৎকালীন মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের থেকে। তৈরী হয়েছে অঁর্লেয়া দুর্গ (১৬৯৬)। ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানীর তত্বাবধানে বাংলা তথা ফরাসডাঙাকে কেন্দ্র করে ফরাসীদের ব্যবসা বাণিজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলার মানচিত্রে কলিকাতাকে তখনও দূরবীণ দিয়ে খুঁজতে হয়। এই সময়ে হুগলী নদীকে নিয়ন্ত্রণ করত অসংখ্য ফরাসী বাণিজ্য তরী। হুগলী নদীতে ফরাসী বাণিজ্য তরীর আধিক্য দেখে কলকাতার ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা তখন নিজেদের দুশ্চিন্তার কথা জানিয়ে মাদ্রাজে চিঠিও লিখত। চন্দননগর ছিল সেকালে বাঙলার শস্য ভাণ্ডার। এখানকার চাউলপট্টি এলাকা তখনকার দিনে বাণিজ্যের দিক থেকে দক্ষিণ বঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এই চাউলপট্টির জগদ্ধাত্রী পুজো তিনশ বছরেরও প্রাচীন বলে শোনা যায়। এখানকার জগদ্ধাত্রী হলেন চন্দননগরের "আদি মা"। শোনা যায় এই পুজোর প্রচলন করেন ফরাসী দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তৎকালীন চন্দননগরের চাউল পট্টির মামুলি ব্যবসায়ী থেকে নিজের বুদ্ধি এবং কর্ম তৎপরতার জোরে হয়ে ওঠেন ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান। তাই ইন্দ্রনারায়ণ চাউলপট্টিতে চালের ব্যবসা শুরু করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই বেশ উন্নতি করেন। চাউলপট্টী ছিল সেকালের বাঙলার শস্য ভাণ্ডার। লক্ষীগঞ্জের বাজারে ছিল ১১৪টি ধানের গোলা, যার এক একটিতে ৬০০০ মণ ধান রাখা হত। ১৭৪২ সালে ১২ লক্ষ টাকা অনাদায়ী খাজনার অপরাধে আলিবর্দি খান কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে কারারুদ্ধ করেন। এই সময় তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হন এবং নবাবের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কৃষ্ণনগর ফিরে গিয়ে তিনি জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু করেন। এই মত যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হয় কৃষ্ণনগরের পুজো শুরু হওয়ার পর। চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো তার আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। খোদ ইন্দ্রনারায়ণের বাড়িতেই জগদ্ধাত্রী পুজো হত। চাউলপট্টির জগদ্ধাত্রীই সেই আদি মা। ১৭৫৭ সালে ক্লাইভের চন্দননগর লুঠের সময় সে পুজো বন্ধ হয়ে যায়, যা আবার শুরু হয় কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পুজো প্রচলনের অব্যবহিত পরে। আজও শোনা যায়, চাউলপট্টির আদি মায়ের পুজোর সংকল্প হতো ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পরিবারের নামে, এবং পাঁঠা বলির পর একটি করে প্রসাদী পাঁঠা প্রতিবার চৌধুরী বাড়িতে পাঠানোর রীতি বছর পঁচিশ আগেও চালু ছিল।

অষ্টমী পূজা ঃ—

দুর্গা অষ্টমীর এক মাস পর শুক্লপক্ষে জগদ্ধাত্রী পূজার অষ্টমী পূজার অনুষ্ঠান হয়।

নবমী পূজা ঃ—

জগদ্ধাত্রী পূজা দুটি পৃথক উপায়ে করা হয়। প্রথমটি হল — সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত মা জগদ্ধাত্রী দুর্গাপূজার একই আচারে পূজা করা হয়। প্রচলিত রীতি হল — জগদ্ধাত্রী পূজার নবমীতে সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী পূজা তিনটি পৃথক পূজা দ্বারা সম্পাদিত হয়। এ কারণে জগদ্ধাত্রী পূজার নবমীকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী মূর্তির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল শোল (থার্মোকল) দিয়ে দেবীর অলংকৃত সজ্জা এবং ছবির পিছনে চিত্রকলা সহ মাদুরের সুন্দর ক্যানভাস।

চাউলপট্টির 'আদি মা' ঃ—

লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারের পিছন দিকে চাউলপট্টির শিববাটী ঘাটের পাশেই আদি মায়ের স্থায়ী মণ্ডপ। এই বাজারের চালের ব্যবসায়ীরাই এককালে এই পুজোর দায়িত্বে ছিলেন। আজ সেই চাউলপট্টির চালের আড়ত না থাকলেও এই বাজারের ব্যবসায়ীরাই এখনও এই শতাব্দী প্রাচীন পুজো চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। পুজো শুরুর সাল তারিখ আজ আর কেউই বলতে পারেন না, আনুমানিক তিনশ বছরের প্রাচীন পুজো হিসাবেই পরিচিত। চাউলপট্টির আদি মায়ের পুজো এখনও আগেকার মত যাবতীয় নিয়মাদি মেনে পালন করা হয়। ষষ্ঠীর দিন মাকে শাড়ি ও গয়না পরানো হয়। চুঁচুড়া, চন্দননগর, হুগলী সহ আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভক্তরা মানত করে মাকে বেনারসি শাড়ি দান করেন। এছাড়া অনেক ভক্তরা নিজেদের মনস্কামনা পূরণ হলে সোনা বা রূপোর গয়না গড়িয়ে দেন। এই সমস্ত শাড়ি ও গয়নায় দেবীর অঙ্গাভূষণ হয়। সপ্তমীর দিন সাতটি বিশাল বারকোশে হয় মায়ের নৈবেদ্যের আয়োজন। সপ্তমী থেকে নবমী প্রত্যেকদিন ছাগবলি হয়, সাথে থাকে আখ, চালকুমড়ো বলিও। নবমীর দিন মাকে ১০৮টি রক্তপদ্ম নিবেদন করার রীতি আছে। আদি মায়ের পুজোর আর একটি বড় বিশেষত্ব হল, গয়না পরানো থেকে শুরু করে প্রতিমা নিরঞ্জন, নৈবেদ্য থেকে শুরু করে প্রতিমা বরণ সবই করেন কমিটির পুরুষ সদস্যরা।

দশমীর পর দিন আদি মায়ের বিসর্জন হয় মায়ের নিজস্ব ঘাটে। প্রায় ২২ ফুটের ওই দেবী মূর্তিকে ভক্তরা কাঁধে তুলে নিয়ে আসেন ঘাট অবধি। ঘাটের আশেপাশে ও গঙ্গাবক্ষে নৌকাতে অগণিত দর্শনার্থীদের ভিড়ে তিল ধারণের জায়গা থাকে না। মূর্তিকে কাঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে গঙ্গায় নেমে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। প্রতিমা জলে পড়ার পর, অন্যান্য মূর্তি বিসর্জনের মত কাঠামোর বিচুলি কেটে ফেলা হয় না। অপেক্ষা করা হয় পরের পূর্ণিমা পর্যন্ত। ততদিন ভাসমান কাঠামো ঘাটেই বাঁধা থাকে। মায়ের গা থেকে বেনারসি শাড়িগুলিও বিসর্জনের পর খুলে নেওয়া হয় এবং বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে সেই শাড়ি দান করা হয়।

আগেকার দিনে মৃন্ময়ী মূর্তির গয়না তৈরি হত মাটির। পরবর্তীকালে মাটির বদলে শোলার উপকরণ দিয়ে মৃন্ময়ী মূর্তিকে সাজানো শুরু হয়। শিল্পীরা শোলার ভিতরের নরম সাদা শাঁসটুকু ব্যবহার করে দেবীর অলঙ্কার তৈরি করেন। দেবীর মাথার মুকুট কিরীট, কানের মাকড়ি, শাড়ি অলংকরণ, হাতির মাথার হাওদা-সর্বত্র এই শোলার সূক্ষ্ম ও নিপুণ কাজ ব্যবহার করা হয়। এর জনপ্রিয় নাম ডাকের সাজ। হাতির দাঁতের কারুকার্যের সাথে এর মিল থাকায় সোলার আরেক নাম 'হারবাল আইভরি'। এই ডাকের সাজের শোলা আসে কাটোয়ার বনকাপাসি থেকে। চাউলপট্টির আদি মায়ের ডাকের সাজ আজও নিজে হাতে তৈরি করেন বনকাপাসির আদিত্য মালাকার। বংশ পরম্পরায় কয়েক প্রজন্ম ধরে তাঁরা এই কাজ করে আসছেন। একই ভাবে মৃৎশিল্পী অসিত পাল বংশ পরম্পরায় আদি মায়ের মূর্তি তৈরী করে আসছেন। এককালে চন্দননগরের বাড়িতে বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে ব্যবসায়ীদের হাত ধরে এই পুজোর পরিধি আড়ে-বহরে কয়েক গুণ বেড়ে উঠেছে। এখন অধিকাংশই বারোয়ারি বা সর্বজনীন পুজো। বাঙলার অন্যান্য জায়গায় জগদ্ধাত্রী

পুজো মাত্র এক দিনের পুজো (নবমী) হলেও চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো চলে চারদিন ধরে। শুক্ল পক্ষের সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত সাড়ম্বরে এই পুজো হয় এবং এই উপলক্ষ্যে চন্দননগর শহর আলোকসজ্জায় এবং মানুষের উৎসাহ উন্মাদনায় এক মহা-কার্নিভালের রূপ ধারণ করে। এককালে এই তিনদিন ধরে চলতো নাটক-যাত্রাপালা, কবিগান, তরজা গান, পুতুল নাচের আসর, চুঁচুড়ার বিখ্যাত সঙের গান ইত্যাদি নানা বিচিত্রানুষ্ঠানের আসর। এখন যদিও এই সমস্ত চিরাচরিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে পিছনে ঠেলে দিয়ে থিমপুজো এবং বিসর্জনের প্রসেশনের আলোকসজ্জাই চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রধান আকর্ষণে পরিণত হয়েছে।

ভদ্রেশ্বর, তেঁতুলতলার বুড়িমা ঃ—

বিসর্জনের আগে মাকে বরণ করে বিদায় জানানোর রীতি সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়। বিদায় বেলায় মেয়ে বউরা নয় পুরুষেরা শাড়ি, শাঁখা, সিঁদূর পরে মাকে বরণ করেন। আজ বলবো সেই অভিনব পুজোর কথা। সেই অভিনব পুজোটি ভদ্রেশ্বরের তেঁতুলতলার গৌড়হাটির। যেখানে পুজোর শুরু থেকেই চলে আসছে এই রীতিতে। পুজোর কাজে মেয়েরা ব্রাত্য। শ্রীরামপুরের জমিদার গোস্বামীরা পুজোর জন্য জমি দেন ভদ্রেশ্বরের তেঁতুলতলা গঙ্গার ঘাটে। সেইখানে শুরু হয় পুজো। সেই থেকে চলছে আজ অবধি। নিজস্ব মন্দিরও আছে সেইখানে। পুজো হয় রীতিমতো নিষ্ঠা ও আড়ম্বরের সাথে। অপূর্ব শোভা মায়ের রূপে, দেহ সুদীর্ঘ, গায়ের রং প্রভাত সূর্যের মতো উজ্জ্বল। ১০০টি বেনারসি লাগে মায়ের বস্ত্র তৈরি করতে, যা বলার অপেক্ষা রাখে না, এটাই মায়ের বিশেষত্ব। বরণের কেন এই অদ্ভুত রীতি তার লিখিত প্রমাণ না থাকলেও লোকশ্রুত। আগে এই পুজো দেখতে আসতো ফরাসিরা ও পরে ইংরেজরাও। তাদের সামনে বাড়ির মেয়ে বউদের বেরোনোয় ছিল নিষেধাজ্ঞা, কিন্তু পুজো তো করতেই হবে। ভার তুলে নিয়েছিল পুরুষেরা। তাই আজও এই রীতিকেই মেনে বয়ে নিয়ে চলেছে ক্লাবের সদস্যরা। তারা সবাই নিজেদের ব্যক্তিগত জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু বরণের সময় শাড়ি, হাতে বালা, শাঁখা, সিঁদুর পরে নিজেদের তৈরি করতে দ্বিধা করেন না। এ কাজকে তারা পরম্পরা বলে মনে করেন। পুজো মন্ডপের পিছনেই থাকে তাদের মেকআপ রুম যাকে আমরা বলে থাকি গ্রীনরুম। রীতি সে যাই হোক তাকে বহন করে নিয়ে চলাই আসল। মায়ের কাজে অগ্রাধিকার সবার, সে পুরুষ হোক বা মহিলা। সেটাই হয়তো বার্তা এই তেঁতুলতলায়। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র চাইতেন জগদ্ধাত্রী পুজোকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। সে সুবাদে কৃষ্ণনগরে বেশ কিছু পুজোর শুরুও হয়েছিল। কৃষ্ণচন্দ্র নিজের নায়েব, গোমস্তা, কোষাধ্যক্ষ সবাইকে অনুদান দিয়েছিলেন নিজের নিজের এলাকায় পুজো শুরু করার জন্য। তাই বিশ্বস্ত কর্মচারীদের অন্যতম ছিলেন দাতারাম সুর। তিনি আনুমানিক ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ বা তার কিছু পর চন্দননগরের গৌরহাটিতে নিজের বাড়িতে দুই বিধবা মেয়েকে নিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু করেন। গৌরহাটি চন্দননগর এলাকায় হওয়ায় কেউ কেউ এই পুজোকেই চন্দননগরের প্রথম পুজো মানতে চান। ৩০ বছর এভাবে পুজো চলার পর দাতারাম সুরের অবর্তমানে এই পুজো বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন স্থানীয় বাসিন্দারা সেই পুজো তুলে আনেন বিশালাক্ষী তলায়। সেখানেও কিছু অসুবিধা দেখা যায়। তখন শ্রীরামপুরের জমিদার গোস্বামীরা তেঁতুলতলায় গঙ্গার ঘাটে জমি দিলে সেখানেই শুরু হয় পুজো যা আজও চলছে

তেঁতুলতলার গৌরহাটির পুজো বলে। পুজো রীতিমতো ঘটা করেই হয়। আর বরণের অভিনব ঘটনার সাক্ষী হতে হাজির হন নানান প্রান্তের মানুষ। ক্যামেরাবন্দি করেন সেই মুহূর্তকে। টিভি চ্যানেল থেকে শুরু করে খবরের কাগজের সাংবাদিক সহ নানান মানুষ ছুটে আসেন।

চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পূজার শোভাযাত্রা ঃ—

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজা চার দিন ধরে পালিত হয়। এখানে বিসর্জন শোভাযাত্রা একটি বিশাল ব্যাপার, যা রিও ডি জেনিরোর রিও উৎসবের পরে বিশ্বের দ্বিতীয় দীর্ঘতম হিসাবে বিবেচিত হয়। আরও মজার বিষয় হল রিওর একমুখী রুট আছে কিন্তু চন্দননগরে মিছিলটি একটি বৃত্তে হয়। এটি দক্ষিণ থেকে উত্তরে শুরু হয় এবং আবার দক্ষিণে ফিরে যায় এবং তারপরে রাণীঘাট, স্ট্র্যান্ড রোডে বিসর্জন হয়।

জগদ্ধাত্রী পূজার দশমীতে 12 কিলোমিটার দীর্ঘ যাত্রায় 12 ঘন্টা ধরে শোভাযাত্রা চলে। কলকাতায় দুর্গাপূজার পর এটি দ্বিতীয় কার্নিভাল। যাইহোক, চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পূজার শোভাযাত্রা সবচেয়ে প্রাচীন কার্নিভাল। চন্দননগরের 171টি জগদ্ধাত্রী পুজা কমিটির মধ্যে 50টি পূজা কমিটিকে বার্ষিক লটারির মাধ্যমে শোভাযাত্রার জন্য নির্বাচিত করা হয়। পূজা কমিটি, যারা তাদের সুবর্ণ জয়ন্তী, রজত জয়ন্তী বা হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপন করে, তাদের শোভাযাত্রায় আরও আলোকিত যানবাহনের অনুমতি দেওয়া হয়। জগদ্ধাত্রী পুজার দশমীতে সন্ধ্যা ৬.০০টায় এই শোভাযাত্রা শুরু হয়ে সারা রাত চলে। কুচকাওয়াজ শেষে, প্রতিমা "মন্ডপে" ফিরে আসে। রীতি অনুযায়ী দশমীর (একাদশী) পরের দিন রাণীঘাটে দেবীকে বিসর্জন দেওয়া হয়। মিছিলের গাড়িগুলো সাজানো হয়েছে বিভিন্ন রঙের এলইডি বাতি দিয়ে। বিশ্বখ্যাত এই শোভাযাত্রা দেখতে প্রতি বছর প্রচুর মানুষ আসেন চন্দননগরে।

চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পূজায় আলোকসজ্জা ঃ—

চন্দননগরের দুই আলোর জাদুকর শ্রীধর দাস ও বাবু পাল; যাদের আলোর ছটায় সারা বিশ্ব আলোকিত হয়।

আলোর বিস্তৃত বৈচিত্র্যের জন্য চন্দননগর বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠেছে। এটি প্রথম 1965 সালে শ্রীধর দাস দ্বারা প্রবর্তন করা হয়েছিল এবং তিনি জগদ্ধাত্রী পূজার জন্য চলমান আলো তৈরি করতে একটি সমতল কাঠের বোর্ড ব্যবহার করেছিলেন। এরপর থেকেই শুরু হয় চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পূজার আলোকসজ্জার যাত্রা। অতীতে, চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পূজার রাস্তা এবং প্যান্ডেলগুলিকে আলোকিত করতে "কমিটি টিউনি লাইট" ব্যবহার করত। তবে আলোর তীব্রতা কম থাকায় বর্তমানে আলোকসজ্জার জন্য LED লাইট ব্যবহার করা হয়। 1990 সালে পুজা কমিটিগুলি জার্মানি, কোরিয়া এবং জাপান থেকে এলইডি লাইট কিনে চন্দননগরে আলোর জন্য ব্যবহার করে।

চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পূজায় দুই ধরনের আলোকসজ্জা রয়েছে। যেমন —

রাস্তার আলো ঃ পূজা প্যান্ডেল কমিটি তাদের প্যান্ডেল সাজায় এবং রাস্তার দুইপাশে আলোকসজ্জা করে, যা রাস্তার আলো নামে পরিচিত।

শোভাযাত্রা আলো ঃ জগদ্ধাত্রী পূজার শোভাযাত্রা এই আলোকসজ্জা প্রদর্শনের প্রধান মঞ্চ। বোনা তারের সাথে সংযুক্ত অসংখ্য রঙিন "টুনি বাল্ব", মুখ থেকে ডাইনোসর বিক্ষিপ্ত আগুন, ডলফিন খেলা, রূপকথা ইত্যাদি আলোকসজ্জার মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়।

চন্দননগরের প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ এই আলোর কাজের সঙ্গে জড়িত। মানুষ এই আলোকসজ্জায় মুগ্ধ হয়ে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজায় আনন্দ করতে আসে।

সুখ ও দুঃখের প্রকৃতি

রিজু চ্যাটার্জী (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

আঁধার আর আলো যেন
গোলাকের দুই ধার
আলো অস্তমিত হলে
নামে জমাট অন্ধকার।

দুঃখ পেলে হৃদয় মনে
নামে অশ্রু ধারা
আনন্দ-লগন আনে
সুখ বাঁধন হারা।

আনন্দময় সুধা মুহূর্তগুলি
অতি দ্রুতই মিলায়
দুঃখ-লগন যেন দীর্ঘ
কাটিতে চায় না হায়।

রঙীন সুখী সেদিনগুলি
ত্বরিত আঁধারে মিলায়
যেন দেবদূতের অশ্রুবিন্দু
দ্রুতই ঝরিয়া যায়।

তাই বিরহ-বেদনা
হৃদয়ে তৈরী ক্ষত
বিচ্ছদ-বিরহ নবীন
হচ্ছে আহত।

এই মরলোকে চলছে নিয়ত
জন্ম মৃত্যুর পালা
কারো বা দুখ, কারো সুখ
সেই শাশ্বত খেলা।

সুখ বড়ই চঞ্চল
একই স্থানে নহে স্থির
দুঃখ যেন সুযোগ খোঁজে
সুখ ভাঙিতে অধীর।

জীবন স্রোত প্রবাহে
সুখ-দুঃখ আলো আবছায়া
মানুষ বানায় সুখ-স্বর্গ
শুধু বেড়ে চলে মায়া।

মানুষ আশাবাদী, তাই
অনন্ত আশা মনে
ভালবাসার পরশ বিহনে
বাস করত বনে।

ভালো লাগার সাথে ভালোবাসার
নিয়মে যে চির বন্দী
এ চির সত্য, সুখ লাগি
মানুষ গৃহে দিয়েছে গন্ডি।

যুগ যুগ ধরে
মানবের সেবায় নিয়োজিত — ভেষজ উদ্ভিদ

সৌরভ হালদার (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

স্বাস্থ্যই সম্পদ, এই সম্পদকেই টিকিয়ে রাখতে মানুষ তাঁর সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে নিরন্তর লড়াই করে চলেছে বিভিন্ন রোগ ব্যাধির সঙ্গে এবং গড়ে তুলেছে চিকিৎসা পদ্ধতি। বর্তমান যুগে আমরা যে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করি সুদূর প্রাচীন যুগে তা ছিল না। প্রাচীন যুগের চিকিৎসা পদ্ধতি কিরূপ ছিল বা প্রাচীন যুগের মানুষেরা কিভাবে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির মোকাবিলা করত এই বিষয়ে কৌতূহল জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে বলা যায় প্রাচীন যুগের মানুষেরা একদিকে তাদের খাদ্য হিসাবে বনের ফল-মূল আহার করত, অন্যদিকে তারা রোগ-ব্যাধির উপশমের জন্য ব্যবহার করত বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদের পাতা, ফুল, ফল, ছাল, মূল প্রভৃতি অংশ। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, প্রাচীন যুগের মানুষের জীবনযাত্রা ছিল অত্যধিক মাত্রায় প্রকৃতি কেন্দ্রিক।

আমরা যদি প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখব এই সময় ভারতে সনাতনি চিকিৎসা পদ্ধতি রূপে আয়ুর্বেদের আবির্ভাব ঘটে, যার মূলভিত্তি ছিল ভেষজ উদ্ভিদ। এছাড়া ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাসে প্রাচীনতম আকর গ্রন্থ 'অথর্ব বেদের' প্রায় ছয় হাজার শ্লোকের মাধ্যমে জ্বর, পান্ডুর, যক্ষ্মা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির নাম ও সেগুলির চিকিৎসার জন্য নিম, কুমুদ, অশ্বগন্ধা, করঞ্জা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ভেষজের উল্লেখ রয়েছে (তথ্যসূত্র ঃ ঊনিশ শতকের বাংলার সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থার স্বরূপ, পৃষ্ঠা-৮) যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহারের প্রাচীনত্বেরই প্রমাণ।

মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে যখন মুসলিম শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এক নতুন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচিতি ঘটে, যার নাম ছিল ইউনানি। আয়ুর্বেদ ও ইউনানি এই উভয় ধারাই এসময় পাশাপাশি চলতে থাকে এবং এই দুই সনাতনি চিকিৎসা পদ্ধতিরই ভিত্তি ছিল ভেষজ উদ্ভিদ।

বর্তমান যুগে এসেও বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির নিরাময়ের ক্ষেত্রে ভেষজ উদ্ভিদ ভিত্তিক চিকিৎসার প্রচলন রয়েছে এবং ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহারের গুরুত্ব ও চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতির ক্ষেত্রেও ভেষজ উদ্ভিদের অবদান অনস্বীকার্য।

ভেষজ উদ্ভিদ বলতে আমরা সেই সকল উদ্ভিকেই বুঝি; যার ঔষধি গুণ রয়েছে। সুপ্রাচীন কাল থেকেই এই সকল উদ্ভিদের পাতা, ফুল, ফল, কাণ্ড, ছাল প্রভৃতি এক বা একাধিক অংশ বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির উপশম বা নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় — নিম, তুলসি, বাসক, আমলকি, হরিতকী, বহেড়া, অর্জুন, ডুমুর, বাবলা, কালমেঘ প্রভৃতি।

আমরা আমাদের শরীরকে সুস্থ ও নীরোগ রাখতে বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদ ব্যবহার করতে পারি। নিম্নে কিছু ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল —

নিম ঃ— আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিমের ব্যবহারের বহুল প্রচলন রয়েছে। নিমের পাতা, ফুল, ফল, ছাল, তেলবীজ এক কথায় সমস্ত অংশই ব্যবহার করা যায়। নিমপাতার রস কৃমিনাশক রূপে ব্যবহৃত হয়। নিমপাতা জলে ফুটিয়ে সেই জল দিয়ে স্নান করলে খোস-পাচড়া, অ্যালার্জির মতো সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। নিমপাতা বেটে গায়ে মাখলে চুলকানির সমস্যা দূর হয়।

অর্জুন ঃ— অর্জুন গাছের ছালের রস ব্যবহার করে আমাশয়, হাঁপানি, ঋতুস্রাব জনিত সমস্যার সমাধান সম্ভব।

হরিতকি ঃ— ত্রিফলার অন্যতম হরিতকি এই ফল চূর্ণ করে কিছুটা লবণ সহযোগে খেলে অর্শ্বরোগের উপশম হয়। পাকাফল রক্তশূন্যতা ও পিত্তরোগের নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

বহেড়া ঃ— বহেড়ার ফল ব্যবহার করে পেটের পীড়া কোষ্ঠ্যকাঠিন্য দূর করা সম্ভব।

আমলকি ঃ— চুল পড়ে যাওয়া বর্তমানে অনেকের ক্ষেত্রেই একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে আমলকির ব্যবহার যাদুর মতো কাজ করে। আমলকি একদিকে যেমন চুলের গোড়াকে মজবুত করে অন্যদিকে চুলের বৃদ্ধিতেও সহায়ক হয়। এছাড়া আমলকি ফলের রস ব্যবহার করে পেটের পীড়া, হজম ও কাশিতে বিশেষ উপকার পাওয়া সম্ভব।

দূর্বাঘাস ও গাঁদাফুল গাছ ঃ— শরীরের কোন অংশ কেটে গেলে বা আঘাত জনিত কারণে রক্তক্ষরণ হলে দূর্বাঘাস বা গাঁদাফুলের পাতা থেঁতো করে আক্রান্ত স্থানে প্রলেপ দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

তুলসী ও বাসক ঃ— সাধারণ সর্দি-কাশি জনিত সমস্যার ক্ষেত্রে বাসক পাতা বা তুলসী পাতার রস সেবন করে প্রতিকার পাওয়া সম্ভব।

কালমেঘ ঃ— কালমেঘ পাতার রস সেবন করলে জ্বর ভাল হয়, লিভার সমস্যা দূর হয়, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ভেষজ উদ্ভিদ ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা সহজেই বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি জনিত সমস্যার প্রতিকার পেতে পারি। ভেষঝ উদ্ভিদ একদিকে যেমন প্রকৃতিতে সহজ লভ্য তেমনি ভেষজ উদ্ভিদ ভিত্তিক চিকিৎসার ক্ষেত্রেও তেমন কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। তাই ভেষজ উদ্ভিদের জনপ্রিয়তা চিরন্তন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় গ্রামের দিকে ফার্মাসিগুলির অবস্থান দূরে হয় আবার শহরাঞ্চলে বসবাস করলেও সকলের বাড়ি থেকে ফার্মাসির দূরত্ব কাছে থাকে না। এক্ষেত্রে হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে ফার্মাসিতে নিয়ে যেতে ও ওষুধ আনতে অনেকটা সময় লেগে যায়। এক্ষেত্রে মারাত্মক বিপদ ঘটে যাবার সম্ভাবনাও

থেকে যায়। আমরা যদি এক্ষেত্রে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার জেনে ঘরোয়াভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করে নিতে পারি; তবে বড় ধরনের বিপদের হাত থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। বর্তমান আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতিতেও রয়েছে ভেষজ উদ্ভিদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

বর্তমান আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতায় আমাদের বিশ্ব প্রকৃতি ক্রমাগত দূষণের মারণ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যার ফল স্বরুপ মানুষসহ সমস্ত প্রাণীকূলের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আজ গুরুতর হুমকির মুখে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের অন্যতম পথ হল ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ বিশেষ করে ঔষধি বৃক্ষের চাষের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। বাড়িতে নিম গাছের মত ওষধি বৃক্ষ থাকলে তা বাতাসের মধ্যে থাকা জীবাণুকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। ফলে আমরা বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির আক্রমণের হাত থেকে সহজেই রক্ষা পেতে পারি। অক্সিজেন ও খাদ্যের জোগানের পাশাপাশি ভেষজ উদ্ভিদ বিভিন্ন জীবনদায়ী ওষুধ তৈরীর উপাদান রূপেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কিছু মানুষ অজ্ঞানতায় অবিবেচনা প্রসূত ভাবে বৃক্ষছেদন করে চলেছে। আবার অনেকে পুরাতন ঝুমচাষ পদ্ধতিতে চাষবাস করতে গিয়ে বন-জঙ্গল পুড়িয়ে ফেলছে। এর ফলে অন্যান্য উদ্ভিদের পাশাপাশি ভেষজ উদ্ভিদও ব্যাপক হারে হ্রাস পাচ্ছে। এই অবস্থার যদি পরিবর্তন না আসে; তবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে খাদ্য, ঔষধ ও অক্সিজেন-এর সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করবে। ফলে তাদের অস্তিত্ব সংকট দেখা দেবে।

এই সমস্যা থেকে মুক্তির অন্যতম পথ হল সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি। এক্ষেত্রে সরকার বা ব্যক্তি বিশেষ শুধু নয় সমাজের সকল সুশীল মননশীল মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে; নিজেদের পাশাপাশি অন্যদের বৃক্ষরোপণ ও ভেষজ উদ্ভিদ চাষের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদের সঙ্গে পরিচিত করে তাদের ব্যবহার ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা এই বিষয়ে সচেতনতার পাঠ পেলে তাদের মাধ্যমে বাড়ির অভিভাবক বা অন্যান্য সদস্যদেরও এই বিষয়ে সচেতন হবার সুযোগ থাকবে, ফলে সমাজের বৃহত্তর অংশের মধ্যে সচেতনতার প্রসার ঘটবে।

সব সময় মানুষের গুণ দেখতে শেখ। একটু গুণ থাকলেও তাকে বড় করে দেখতে হবে, সম্মান দিতে হবে, প্রশংসা করতে হবে। গুণের আদর না করলে মানুষ বড় হতে পারে না।

— স্বামী ব্রহ্মানন্দ

সাধুচরণ

নির্মল সাধুখাঁ (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

১

শহরের জনবহুল রাস্তা আজ ফাঁকা। হাতে গোনা কয়েকটি গাড়ি বিক্ষিপ্ত ভাবে চলাচল করছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে দু-একটি দোকান খোলা রয়েছে, বাকি সবই বন্ধ।

মোড়ের মাথার একটা দোকান থেকে তিন টাকা দামের পাঁউরুটি দশ টাকা দিয়ে কিনল সাধু। রুটিটা তিনটে ভাগ করে একটা ভাগ খেয়ে নিল সে, বাকি দুটো পরে খাবার জন্য রেখে দিল। তারপর দোকান থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার কলে গিয়ে পেট ভরে জল খেয়ে নিল। এবার সে হাঁটতে শুরু করল, তাকে হেঁটে হেঁটেই পৌঁছতে হবে গ্রামের বাড়িতে। আজ তিনদিন ধরে হাঁটছে সে। রাস্তায় যদিও অল্পবিস্তর গাড়িঘোড়া চলছে কিন্তু তার ভাড়া পাঁউরুটির দামের মতোই প্রায় ডবল হয়ে গেছে।

শান্তশিষ্ট, মূর্খ আর গোবেচারা বলতে যা বোঝায় সাধু হচ্ছে তাই। বাবা, মা, আত্মীয় পরিজন তার কেউ নেই। ছোট বেলা থেকেই শহরের একটা কারখানায় সে কাজ করত, ফলে তার খাওয়া পরার অভাব কোনদিন হয়নি। কিন্তু বিপদ ঘটল হঠাৎ করে করোনা ভাইরাসের আবির্ভাব হয়ে; ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে সরকার সারা দেশে লকডাউন জারি করে দিল, তাদের কারখানাও বন্ধ হয়ে গেল। কাজ না থাকলে তো আর শহরে থাকা যায় না, টাকা না থাকলে খাবে কি? তাই সাধু গ্রামের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।

আর মোটামুটি ঘন্টা চারেক হাঁটলেই সে গ্রামে পৌঁছে যাবে। সাধুর মনটা খুশিতে ভরে উঠল। অবশিষ্ট যে কটা টাকা পকেটে পড়ে রয়েছে তা দিয়ে গ্রামের দোকান থেকে চাল, ডাল কিছু কিনে তারপর বাড়িতে ঢুকবে, আজ তিনদিন সে রুটি আর জল খেয়েই কাটিয়েছে। বাড়িতে গিয়েই আগে ভাত বসিয়ে দেবে; তিন দিন ভাত খেতে পায়নি বলে কথা। ভাত খেতে পাওয়ার উৎসাহে আরো জোরে জোরে পা চালাতে লাগল সাধু।

একটা সময় তিন দিনের পরিশ্রমের অবসান ঘটিয়ে সাধু গ্রামের সীমানা দেখতে পেল। সে একটু অবাকই হল; দেখল গ্রামে প্রবেশের বড় রাস্তাটা বেড়া দিয়ে ঘেরা রয়েছে। কেন রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে তা অনেক ভেবেও কিছু বুঝতে পারল না সে, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনা করে বেড়া ডিঙিয়ে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করল সাধু।

পুকুরটার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সাধু নিজের বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। তখন তার সাথে নরেন খুড়োর দেখা হল, নরেন খুড়ো তাদের গ্রামের প্রধান; গ্রামের সকলে তাঁকে খুব মান্যগণ্যও করে। "কর্তা ভালো আছেন?" সাধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করল।

"একি! সাধু যে! এই দুর্দিনের সময় গ্রামে কি করতে এলি বাবা? শহরেতেই তো ভালো থাকতিস, তারপর কেমন আছিস বল!" নরেন খুড়ো সাধুকে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল।

"ওই আছি কর্তা, সাধ করে কি আর গ্রামে এসেছি। কারখানা তো বন্ধ, কাজ না হলে খাব কি কর্তা? তাই তো সব শ্রমিকরাই গ্রামে ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছে" সাধু বললো।

"সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু তোকে তো গ্রামে থাকতে দেওয়া হবে না, গ্রামবাসীরা মিলে ঠিক করেছে শহরবাসী কাউকে গ্রামে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। সবারই তো প্রাণের মায়া আছে। তার জন্যই তো গ্রামের সীমানায় বেড়া দেওয়া হয়েছে, আর তোর সাহসকে বলি রে, তুই বেড়া ডিঙিয়ে কার অনুমতিতে গ্রামে ঢুকলি?" নরেন খুড়ো উত্তেজিত কণ্ঠে বলল।

"কিন্তু কেন কর্তা?" সাধু বোকার মতো জিজ্ঞাসা করল।

"কেন কি রে, করোনা তো শহরেই শুরু হয়েছে, আর তুই তো এতদিন শহরেই ছিলিস্, কি থেকে যে কি হবে কিছু কি বলা যায়। গ্রামবাসী কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না, তাই বাইরের কাউকে আর গ্রামে প্রবেশ করতে দেবে না।" নরেন খুড়ো গলার স্বর একটু নরম করেই সাধুকে বোঝাল।

"তাহলে কর্তা, আমি থাকব কোথায়, খাবো কি? নিজের বাড়ি থাকতেও আমি সেখানে থাকতে পারব না!" সাধুর গলায় একরাশ বিস্ময়।

নরেন খুড়ো এবার উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, "না, থাকতে পারবি না নিজের বাড়িতে। গ্রামের সীমানা পেরিয়ে মাঠের মাঝে খড়ের তাঁবু বানিয়ে থাকতে হবে তোকে। সপ্তাহে একবার করে গ্রামের সীমানার কাছে টাকা নিয়ে আসবি, আমরা চাল, ডাল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিস তোকে কিনে দেব, সেগুলি নিয়ে আবার নিজের তাঁবুতে ফিরে যাবি। খবরদার গ্রামের সীমানা পেরিয়ে গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করবি না।"

এ কথায় সাধু খুব ঘাবড়ে গেল। সে বললো, "কিন্তু কর্তা, আমার কাছে তো অত টাকা নেই যে বসে বসে খেতে পারব, গ্রামে কিছু কাজ না করতে পারলে আমি টাকা পাব কোথায়?"

"কেন এতদিন কারখানায় কি ভেরেণ্ডা ভাজছিলিস? টাকা গুলো কি করলি সব? ফালতু বকে বকে মাথা গরম করাস না, যা টাকা আছে দে, চাল, ডাল, তেল, নুন সব কিনে এনে দিচ্ছি। তারপর ওখান থেকে এক বোঝা খড় তুলে নিয়ে বিদায় হ তো এখান থেকে।" উত্তেজিত নরেন খুড়ো সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন।

সাধু প্রতিবাদ করে উঠলো, "আমার বাড়ি থাকতেও আমি মাঠে থাকব এটা কি অন্যায় নয় কর্তা!"

"আবার ন্যায় অন্যায় বুঝতে শিখে গেছিস দেখছি, শহরে গিয়ে নিজেকে খুব বড় মনে করছিস না? পরিস্থিতি ঠিক হোক তারপর তোর ব্যবস্থা করছি।" নরেন খুড়ো এবার এক চোট শাসালো সাধুকে।

সাধু তাঁর পায়ে ধরতে গেল, "না না কর্তা, আমি তো এমনি বললাম আমাকে ক্ষমা করে দাও, কর্তা।"

"সর, সর হতচ্ছাড়া আমার থেকে দূরে থাকতে বলেছি তোকে। তাড়াতাড়ি বিদায় হো এখান থেকে"। এই কথা বলে নরেন খুড়ো নিজের কাজে চলে গেলেন। সাধুও নিজের অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে ক্ষুণ্ণ মনে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনে নতুন বাসস্থান তৈরি করার জন্য মাঠের দিকে চলে এল।

২

জ্যোৎস্নাভরা রাত, মাঠের ধারে ছোট ডোবাটার পাড়ে সাধু বিমর্ষ মুখে বসে আছে। আজ চারদিন হল সাধু জল ছাড়া কিছু খেতে পায়নি, তার হাতে আর একটা টাকাও অবশিষ্ট নেই। জমানো টাকায় সাধুর সপ্তাহ তিনেক চলেছিল, জিনিসপত্রের যা দাম বেড়েছে, না হলে হয়ত আরো কিছুদিন সে চালিয়ে নিতে পারত। গ্রামে যে কাজ করে কিছু টাকা উপার্জন করবে সে রাস্তাও বন্ধ, কিন্তু পেট তো আর কারো কথা শুনবে না। সকালে যেমন প্রতিদিন সূর্য ওঠে, তেমনই আমাদেরও প্রতিদিন খিদে পায়। আসলে খিদের কোন সীমানার কাঁটা তারের বেড়া হয় না। ক্ষুধার্থ অসহায় মানুষদের কোন দেশ হয় না। কারণ তারা চিরকাল সমাজ, সরকারের হিসেবের বাইরেই থেকে যায়।

বসে বসে সাধু ভাবছিল, এটা আমার নিজেরই গ্রাম, এই গ্রামেই আমি কত খেলা করেছি, বন্ধুদের সাথে কত ঝগড়া, মারামারি করেছি, একই থালায় বসে খাবার খেয়েছি, আর আজ তারাই আমাকে গ্রামে ঢুকতে দিচ্ছে না। আজ চারদিন যে খাওয়া হয়নি সেটা কেউ একবারও দেখল না। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কি মনে হল সাধু উঠে দাঁড়াল, তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে সে নিজের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। গ্রামের সীমানায় পৌঁছে বেড়াটা ডিঙিয়ে আবার হাঁটতে লাগল।

খিদেয়, তেষ্টায় ক্লান্ত, অবসন্ন শরীরটা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে যে কোথায় চলেছে তা নিজেও বুঝতে পারল না। অবশেষে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় টোকা মারার জন্য হাতটা তুলতে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তেই সাধুর মাথা ঘুরে গেল, সে জ্ঞান হারিয়ে দরজার সামনেই লুটিয়ে পড়ল।

কার যেন চিৎকারে সাধুর জ্ঞান ফিরলো। চোখ খুলে তাকিয়ে সে দেখল, গ্রামের সীমানার কাছে বুড়ো বট গাছটার নীচে সে শুয়ে আছে। আর নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে গ্রামের সবাই তাকে গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামের প্রধান নরেন খুড়ো কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তার দিকে এগিয়ে এলেন, "তোকে বারবার বারণ করা সত্বেও তুই আবার গ্রামে এলি, তাও আবার রাতের অন্ধকারে চুরি করতে। তোর সাহস হয়েছে রে সাধু, আবার মুখ খোলা রেখে বসে আছিস। সরকার থেকে বারবার নাক, মুখ ঢাকা দিয়ে ঘুরতে বলছে, আর তুই কিনা বাইরে থেকে এসে মুখে চাপা না দিয়েই গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। আমাদেরকে কি তুই বাঁচতে দিবি না! তুই আমাদের গ্রামের ছেলে তাই তোকে গ্রামের সীমানার বাইরে থাকতে দিয়েছিলাম, এখন দেখছি কি মস্ত বড় ভুলটাই না করেছিলাম। না, আর নয় এবার তোর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে দেখছি।"

নরেন খুড়ো আবার গ্রামবাসীদের দিকে এগিয়ে গেলেন, "সাধুকে কি করা যায় বল তোরা সবাই?"

গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা বিশাল গুঞ্জন শুরু হল। কেউ বললো হতচ্ছাড়াকে পুলিশের হাতে তুলে দাও চুরি করতে আসার মজা বুঝবে তাহলে। আবার অনেকে বললো, না তাতে ব্যাটা এই দুর্দিনেও ঠিক সময়ে খেতে পাবে, তার থেকে বরং গ্রামের বাইরে না খেতে দিয়ে কড়া পাহারায় রাখা হোক। অনেকে আবার বললো, ব্যাটাছেলেকে গাছের সঙ্গে বেঁধে গায়ে পিঁপড়ে ছেড়ে দিলে কেমন হয়? ভিন্ন জনে ভিন্ন ভিন্ন মত দিল।

কোন ঐক্যমত্য না হওয়ায় নরেন খুড়ো সবাইকে শান্ত করালেন, তারপর সাধুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "সাধু, তুই আগে বল কেন চুরি করতে এসেছিলি?"

করুণ কণ্ঠে সাধু বললো, "আজ্ঞে কর্তা আমি তো চুরি করতে আসিনি, খাবারের সন্ধানে গ্রামে এসেছিলাম। তারপর কি হয়েছে কিছু মনে নেই আমার।"

নরেন খুড়ো উচ্চ স্বরে হেসে উঠলেন, "খাবারের সন্ধানে এসেছিলি, বলি তোর বাপ কি গ্রামে খাবার নিয়ে বসে ছিল নাকি?"

সাধু কি উত্তর দেবে ঠিক বুঝতে না পেরে দুবার ঘাড় নাড়ল, যার অর্থ নাও হয় আবার হ্যাঁও হয়।

"ঠিক আছে তুই যখন খেতেই এসেছিলি তখন তোকে আমিই খেতে দেব, আর তোকে এখানে বসেই খেতে হবে এবং এটাই গ্রামে তোর শেষ খাওয়া হবে। খাওয়ার পর গ্রাম আর গ্রামের ত্রিসীমানা ছেড়ে তোকে চলে যেতে হবে" কর্কশ ভাবে হাসতে হাসতে নরেন খুড়ো বললেন।

সাধুর চোখে এক বিন্দু আশার আলো জ্বললেও নরেন খুড়োর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকায় সে নীরবে বসে রইল।

নরেন খুড়ো গ্রামের একজন ছোকরাকে ডেকে আদেশ দিল, "এই রাসু তাড়াতাড়ি গিয়ে দোকান থেকে আমার নাম করে একশো গ্রাম মুড়ি আর দুশো গ্রাম কাঁচা লঙ্কা নিয়ে আয় তো। ব্যাটার খাওয়ার শখ মিটিয়ে দিই।"

কিছুক্ষণ পর রাসু মুড়ি আর কাঁচা লঙ্কা নিয়ে হাজির হলো। নরেন খুড়ো রাসুর থেকে মুড়ির ঠোঙাটা নিয়ে সাধুর দিকে বাড়িয়ে দিল, "নে হতচ্ছাড়া খা, খেয়ে বিদায় হো এখান থেকে।"

চারদিনের অনাহারক্লিষ্ট সাধু কাঁচালঙ্কা সুদ্ধ মুড়ি গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলো। খিদের জ্বালায় শসা দিয়ে মুড়ি খাবার মতো করে এত গুলো লঙ্কা সে খেয়ে ফেলল। খাবার পর সাধু টের পেল, তার শরীরে এবার তীব্র ঝালের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। গলা, বুক, জিভ, কান সব জ্বলছে, দরদর করে ঘাম ঝরছে তার শরীর থেকে।

পশ্চিম আকাশে এই কিছুক্ষণ আগে সূর্য ডুবল। সাধু গ্রাম থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা বাজারে উপস্থিত হয়েছে। কোথায়, কোনদিকে সে এসেছে তা সাধু জানে না, ঝালের চোটে এক উন্মত্ত নেশায় সে হেঁটে বেড়িয়েছে। হঠাৎ সে আবার খিদেটা অনুভব করল, শরীরটা যেন খিদেয় মোচড় দিয়ে উঠলো। আর সহ্য করতে না পেরে সে সামনের চায়ের দোকানটাতে ঢুকে তরকারি আর মুড়ি দিতে বললো। অনেক দিন পর সে তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছে; ধীরে ধীরে সে খাওয়া শেষ করল। এবার টাকা দিতে হবে, একবার সাধু ভাবল ছুটে পালিয়ে যাবে দোকান থেকে; কিন্তু এই অবসন্ন শরীরে তা সম্ভব নয় ভেবে নিরস্ত্র হল। সে অকপটে দোকানদারকে বলেই দিল, "কর্তা, আমার কাছে মুড়ির দাম মেটাবার মত টাকা নেই।"

দোকানদার রূপেণবাবু কিছুক্ষণ কটমট করে সাধুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। সাধু ভাবল এইবার বুঝি দোকানদার তাকে মেরে দোকান থেকে বের করে দেবে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। রূপেন বাবু সাধুর পোষাক, চেহারা এবং অনাহারক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কতদিন না খেয়ে আছ ভাই?"

সাধু এই ব্যতিক্রমী ব্যবহারে কিছুটা হকচকিয়ে গেল, সে বললো, "আজ্ঞে কর্তা পাঁচদিন।"

"আচ্ছা ঠিক আছে। চায়ের কাপ আর থালাগুলো ধুয়ে ফেল তো দেখি" তিনি বললেন।

সাধু থালা ধুতে বসল। থালাগুলোতে অবশিষ্ট যে খাবার গুলো পড়েছিল সেগুলোও সে খেয়ে নিল। এখন অনেকটা শক্তি ফিরে এসেছে তার মধ্যে, অনেকদিন পর সে পেট ভরে খেয়েছে। মন দিয়ে পরিষ্কার করে থালা আর কাপগুলো ধুয়ে ফেলল সে। রূপেন বাবু তার কাজ দেখে খুবই খুশি হল, তিনি বললেন, "বাঃ কাজকম্ম তো ভালই করতে পারিস দেখছি তাহলে কাজ করে খাস না কেন?"

"শহরে তো কাজ করতাম কর্তা। কিন্তু ওই যে কি একটা রোগ হচ্ছে তার জন্য আমাদের কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে, গ্রামে গেলাম সেখানেও থাকতে দিল না।" করুণ স্বরে সাধু বললো।

"ও বুঝতে পেরেছি এবার কি হয়েছে, তুই পরিযায়ী শ্রমিক তাই গ্রামেও থাকতে দেয়নি তোকে। তুই আমার কাছে কাজ করবি? কিন্তু খবরদার তুই যে শহর থেকে এসেছিস সে কথা আর কখনো মুখে আনবি না" রূপেণবাবু বললেন।

কাজের কথা শুনে সাধু যেন একেবারে হাতে স্বর্গ পেল। "হ্যাঁ কর্তা, আপনি বললে করব বৈকি। কিন্তু শহরে থাকি বললে কি হবে কর্তা?" সাধু বোকার মতো জিজ্ঞাসা করলো।

"তুই একদম হাঁদারাম রে, নইলে আমাকে কখনো গর্ব করে বলতিস না যে, তুই শহরে কাজ করতিস। নে, এখন কাজ কর তো রাতে কথা বলব তোর সাথে, দোকানে অনেক খদ্দের আসছে এবার" রূপেনবাবু একটু ঝাঁজের সাথেই সাধুকে বললো।

রাত দশটা, দোকান বন্ধ করে দিয়ে সাধু খাওয়া-দাওয়া করে রূপেণবাবুর সাথেই দোকানের ভিতর শুয়ে পড়ল। দুটো মাদুর পেতে পাশাপাশি শুয়েছে তারা। "তোর নামই তো এখনও জিজ্ঞাসা করা হয় নি রে? কি নাম তোর?" রূপেণবাবু সাধুকে জিজ্ঞাসা করল।

"আজ্ঞে কর্তা সাধু, সাধুচরণ" জবাব দিল সাধু।

"বাঃ খাসা নামখানা তো! তারপর তুই যখন গ্রামে গেলি সবাই তোকে কি বললো, বল শুনি?" কৌতূহলী হয়ে রূপেণবাবু বললেন।

সাধু প্রথম থেকে শুরু করে তাকে চোর অপবাদ দিয়ে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া পর্যন্ত সবই বলে গেল। সব শুনে রূপেণবাবু বললেন, "বাঃ বাঃ বাঃ, তোর বাবা-মা কত আশা করে তোর নাম রেখেছিল সাধুচরণ, তারা ভেবেছিলেন তাদের ছেলে একজন সৎ, সজ্জন, ভালো ব্যক্তি হবে, আর শেষে কিনা তোকে চোর বদনাম দিয়ে গ্রাম থেকে বের করে দিলো।

সাধুর চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল, "হ্যাঁ কর্তা, তখন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। নিজের প্রতি যা রাগ হচ্ছিল কি বলব তোমায় কর্তা, কেন যে লুকিয়ে লুকিয়ে গ্রামে ঢুকতে গেলাম।"

"ওই রকমই হয় রে সাধু!" দীর্ঘশ্বাস ফেলে রূপেণবাবু বললেন।

সাধু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, "কি রকম কর্তা?"

"ওই নামের কথাই বলছি রে, মানুষ যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে ছেলেদের নামকরণ করে, ছেলেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার বিপরীত দিকেই প্রতিফলিত হয়। আমাদের ইতিহাসও সেরকমই বলে। অনেক কাল আগে ছোটবেলায় পড়েছিলাম, অজাতশত্রু নামে একটা রাজা ছিল। তাঁর বাবা-মা ভালোবেসে নাম রেখেছিল অজাত শত্রু, এর মানে হচ্ছে যার কোন শত্রু নেই, কিন্তু তিনি যখন রাজা হলেন দেখা গেল সবসময়ই শত্রুরা তাঁকে ঘিরে রয়েছে" একটানা বলে রূপেনবাবু থামলেন।

"বলছি কর্তা, তুমি অত পড়াশোনা করে চায়ের দোকান চালাচ্ছো কেন?" সাধু রূপেণবাবুকে জিজ্ঞাসা করল।

রূপেণবাবু বললেন, "আরে হাঁদারাম চাকরি পাওয়া কি অত সহজ ব্যাপার! আর আমি তো বেশি দূর লেখাপড়া করিনি, বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তাই এই চায়ের দোকানটা খুলেছিলাম।"

"আচ্ছা কর্তা বড়লোক হতে গেলে কি করতে হবে?" সাধু জিজ্ঞাসা করল।

"কেন বেশ তো আছিস, আবার বড়লোক হবার স্বপ্ন কেন?" হাসতে হাসতে রূপেণবাবু বললেন।

"বড়লোক না হলে কেউ ভালোভাবে কথা বলে না, সম্মান করে না কর্তা। আমি যেই শহরে কাজ করতাম ওখানে মুখুজ্জেদের ছোট ছেলেটাও কাজ করত; যখন শহরে সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল তখন সেও আমার মত গ্রামে এসেছিল। কিন্তু আমাকে গ্রামে ঢুকতে দিল না আর সে দেখলাম গ্রামে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। টাকা থাকলে সবই হয় কর্তা। আমাকে যেদিন চোর বলে সবাই বের করে দিল সেদিন ওই ছেলেটাকেও আমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম" সাধুর কণ্ঠে অভিযোগের সুর।

"এটা তুই ঠিকই বলেছিস সাধু, যাদের টাকা আছে সমাজটা যেন তাদেরই হাতের পুতুল" রূপেণবাবু সাধুকে সান্ত্বনা দিলেন।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম কর্তা, আমি যে শহরে থাকতাম তুমি সেটা বলতে কেন বারণ করেছিলে বললে না তো?" সাধু আবার বোকার মত প্রশ্ন করল।

"আরে হাঁদারাম এতক্ষণ কি শুনলি তাহলে, নিজেই তো বললি যে শহরে থাকতিস বলে তোকে গ্রামের মানুষ গ্রামে থাকতে দেয় নি। এখানে যদি সবাইকে বলিস যে তুই শহরে ছিলিস এতদিন, তাহলে এখান থেকেও সবাই বের করে দেবে তোকে। তোর সাথে কথা বলাই বৃথা, আর বকতে হবে না ঘুমো এবার" রূপেণবাবু এবার বিরক্ত হয়ে পড়লেন।

অনেকদিন পর সাধু তৃপ্তি করে ঘুমাল। সে স্বপ্ন দেখলে যে, সে অনেক বড়লোক হয়ে গেছে, রাজপ্রাসাদের মত বাড়িতে বসবাস করছে। একটা মোটর গাড়ি করে বিকালে সে বেড়াতে বেরিয়েছে আর কত লোক দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান দিচ্ছে।

এরপর আরো কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। সাধুর মনে এখন একটাই চিন্তা যেমন করেই হোক তাকে বড়লোক হতে হবে। দোকানে আসা সব ধনী খরিদ্দারদের সে লক্ষ্য করতে শুরু করেছে; তাদের আচার ব্যবহার, পোশাক-আশাক, কথাবার্তা সব কিছুই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছে। তার চোখে ধরা পড়ল যোগেশ আচার্য, একজন নামকরা জ্যোতিষী, প্রভূত ধনের অধিকারী এবং সবাই তাকে খুব সম্মানও করে। ভানু মিস্ত্রি একজন দক্ষ কাঠ মিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি হলেও অনেক টাকা আছে তার। তারপর হাবলা মস্তান, গ্রামে দাদাগিরি করে অনেক টাকা করেছে। সাধু সবাইকে দেখে আর ভাবে, কি উপায়ে সে অনেক টাকার, অনেক সম্মানের মালিক হবে।

হঠাৎ একদিন চায়ের কাপ ধুতে ধুতে সাধু দেখল এক থুরথুরে বুড়ো লাঠি হাতে তাদের দোকানের দিকে আসছে। বয়স আশির বেশি তো হবেই নব্বইও হতে পারে। এক মাথা সাদা চুল, গায়ে একটা ছেঁড়া গেঞ্জি, ধুতির অনেক জায়গায় তালি মারা। বুড়োকে দেখে হাবলা মস্তান হাতের সিগারেটটা লুকিয়ে নিভিয়ে ফেলল, তারপর বুড়োর দিকে তাকিয়ে হালকা হাসি। চা দিতে দেরি হচ্ছিল বলে ভানু মিস্ত্রী চেঁচাছিল, সেও গলার স্বর পাল্টে ফেলল। সাধু সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হল যখন সে দেখল, সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী অতুল বাবু গাড়ি করে কোথাও একটা যাচ্ছিলেন, তিনিও গাড়ি থেকে নেমে বুড়োকে প্রণাম করলেন, বুড়োর সাথে কথা বলে তারপর নিজের কাজে গেলেন। বুড়ো এরপর দোকানে এসে দুটো আটার বিস্কুট কিনে ধীরে পায়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

সাধু বুঝে গেল এই বুড়োটা অনেক ধনী ব্যাক্তি, ওনার সাথেই তাকে যোগাযোগ করতে হবে। যদিও কেন যে বুড়োটা ছেঁড়া পোশাক পরেছিল সেটা সে বুঝতে পারল না। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সাধু রূপেণবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, "কর্তা, আজ সকালে যে বুড়োটা দোকানে এসেছিল উনি কে? দেখলাম সবাই খুব সম্মান করল তাঁকে।"

"আরে উনি তো রতনবাবু, সম্মান করবে না" রূপেণবাবু বললেন, "ওনারাই তো স্বাধীনতা এনেছিলেন; সে কি কম কথা!"

সাধু বললো, "স্বাধীনতা মানে সেটা কি বড় ধরনের কিছু একটা, মানে....."

রূপেণবাবু বললেন, "স্বাধীনতা মানে বুঝবি তুই, তা হলেই হয়েছে। অত কষ্টে পেতে হয় এ জিনিস আর রক্ষা করা আরো কঠিন।" তারপর বললেন, "নে নে ফালতু কথা থাক এবার ঘুমিয়ে পড়।"

সাধুর যা বোঝার বুঝে গেল, স্বাধীনতা নামে একখানি দামী জিনিস রতন বুড়োর কাছে আছে, যার জোরেই তাঁর এত সম্মান। সে রূপেণবাবুকে জিজ্ঞাসা করে আরো জানল যে, রতন বুড়োর কোন সন্তান নেই। সাধু ভেবে নিল তার মানে বুড়ো মরলে তাঁর সম্পদ ভোগ করবার কেউ নেই। একবার যদি বুড়োর সাথে দেখা করে নিজের সমস্যার কথা বলা যায়; আর বুড়ো মরার আগে যদি কিছুটা স্বাধীনতা নামী-দামী জিনিস তাকে দান করে তাহলে সে বাকি জীবনটা রাজার হালে কাটাতে পারবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ, সাধু রূপেণবাবুর থেকে রতন বুড়োর ঠিকানা জেনে নিল।

পরেরদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া করে সাধু বেরিয়ে পড়ল রতন বুড়োর সাথে দেখা করতে। রূপেণবাবুর দেওয়া ঠিকানায় এসে তো সে অবাক এ কোথায় এসেছে, নিশ্চই ঠিকানা ভুল হয়েছে। সে একটা জরাজীর্ণ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হিসেব মত তো রতন বুড়োর বড় অট্টালিকা হওয়ার কথা। সাধু একবার ভাবল দোকানে ফিরে গিয়ে ঠিকানাটা ঠিক করে জেনে তারপর আবার আসবে; কিন্তু তাতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং এই বাড়িতে ঢুকেই রতন বুড়োর ঠিকানাটা জেনে নেওয়া যেতে পারে। একটু দোনামনা করে সাধু জরাজীর্ণ বাড়িটায় প্রবেশ করল।

বাড়িটায় ঢুকে সাধু আবার অবাক হয়ে গেল, সামনে দেখল রতন বুড়ো শুয়ে রয়েছে। একটু গলা খাকরানি দিয়ে সে বৃদ্ধের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। রতন বুড়ো হঠাৎ বাড়ির মধ্যে অপরিচিত ব্যক্তি দেখে প্রশ্ন করল, "কে হে, এই ভরদুপুরে কি মনে করে? এই সময় তো কেউ আমার কাছে আসে না।"

"আজ্ঞে কর্তা, আমার নাম সাধু। আমি রূপেণবাবুর দোকানে কাজ করি। বড় অর্থকষ্ট আমার, আপনার থেকে তাই কিছু সম্পদ ভিক্ষা করতে এসেছি। বিনয়ের সাথে সাধু বললো।

"আমার কাছে তুই কি সম্পদ পাবি রে?" দেখছিস না আমার বাড়ির অবস্থা, বর্ষাকালে ভিতরে জল ঢোকে তাও মেরামত করতে পারি নি, দুবেলা ঠিকমত খাবারও পাই না। গ্রামের কেউ দয়া করে খেতে দিলে তারপর খেতে পাই" দুঃখ মিশ্রিত কণ্ঠে রতন বুড়ো বললেন।

"আপনার কাছে স্বাধীনতা নামে একখানি দামী জিনিস আছে শুনলাম, আমি ওটার কথাই বলছি কর্তা" সাধু বললো।

"স্বাধীনতা নামে দামী জিনিস। কে বললো তোকে?" রতন বুড়ো খুবই অবাক।

"তেমনই তো শুনলাম কর্তা। আপনি নাকি স্বাধীনতা নিয়ে এনেছেন, তার জোরেই এত মানসম্মান আপনার। আমি তো নিজের চোখেই দেখেছি সবাই খুব মান্যগণ্য করে আপনাকে" সাধু বললো।

হো হো করে হেসে উঠলো রতন বুড়ো। হাসি যেন আর থামতেই চায় না। শেষে কোনরকমে হাসি থামিয়ে বললেন, "তা তোমার এত অর্থের প্রয়োজন কিসের? দিব্যি তো চায়ের দোকানে কাজ করে পেট চলে যাচ্ছে।"

"তা যাচ্ছে কর্তা, তবে টাকা-পয়সা না থাকলে, ধনী না হলে কেউ সম্মান দেয় না।" হতাশ স্বরে সাধু বললো।

"কে বলেছে তোকে টাকা না থাকলে, ধনী না হলে কেউ সম্মান করে না। আমার তো টাকা-পয়সা, ঘর-বাড়ি কিছুই নেই তবুও তো তোর মনে হয়েছে লোকে আমাকে সম্মান করে" রতন বুড়ো বললেন।

"আপনার কাছে যে স্বাধীনতা আছে কর্তা, তাই তো সবাই আপনাকে এত সম্মান করে। আমি তো সেই জন্যই আপনার কাছে একটুখানি স্বাধীনতা সম্পদ ভিক্ষা চাইছি। দিন না কর্তা, কিছুটা স্বাধীনতা দিন না" সাধু রতন বুড়োর পায়ের কাছে বসে পড়লো।

"আসলে কি জানিস সাধু, এ জিনিস কেউ কাউকে দিতে পারে না। চুরিও করা যায় না, মেহনত করে পেতে হয় বুঝলি?" রতন খুড়ো সাধুকে বোঝাল।

সাধু বললো, "আমি মুখ্য মানুষ, পরের দোকানে কাজ করি, অতশত বুঝব কি করে কর্তা।"

"চেষ্টা করলে ঠিক পারবি। একসময় আমাদের দেশের মানুষও এমনই ভাবত, তাই তখন তাদের বড় কষ্ট ছিল। মনের জোর আন, মাথাটা একটু কাজে লাগা দেখবি তুই কখন স্বাধীনতা পেয়ে গেছিস। জিনিসটা যদি একবার পেয়ে যাস তাহলেই তুই রাজা। তখন আর কাউকে পরোয়া করবার দরকার নেই" রতন বুড়ো বললেন।

"তাহলে কর্তা, আপনি তো স্বাধীনতা পেয়ে রাজা হয়ে গেছেন। কিন্তু একটু আগেই তো আপনি বললেন যে, দুবেলা ঠিকমত খাবার পান না, বর্ষায় বাড়িতে জল পড়ে তাও মেরামত করতে পারেননি। রাজাদের কি এইরকম দুর্গতি হয় কর্তা?" সাধু কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল।

"আসলে সাধু, এমন অনেক প্রশ্ন আছে যার উত্তর চাইবার মানুষ নেই। কারণ প্রতিবাদী মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে প্রতিবাদের ভাষাটাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে" রতন বুড়ো হতাশ কণ্ঠে জবাব দিল।

সাধু আবার প্রশ্ন করল, "তাহলে কর্তা, আমরা কি এই প্রশ্নের উত্তর পাব না?"

"অবশ্যই পাবি, শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, একদিন ঠিকই উত্তর পাবি।"

অভিশপ্ত লালদীঘি

নাগর মাঝি (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

নিঝুম রাতে একা একা পথ চলছি, চারিদিকে শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। বলে রাখা ভালো আমি শহরে বাস করি। অনেক দিন পরে আমাদের গ্রামের বাড়ি যাওয়া হচ্ছে। রাত যখন দুটো বেজে পাঁচ মিনিট তখন শহর থেকে গ্রামে বাস এসে দাঁড়ায়। মাঝ রাস্তায় বাস খারাপ হয়ে যায় তাই এত লেট। বাস থেকে নেমে যে যার মতো করে চলে গেল।

ঝুঝতে পারলাম আমার দাদুর বাড়ি যাওয়ার রাস্তায় আমি ছাড়া আর কেউ যাবে না, তাই এই বিশাল রাস্তা চলতে শুরু করলাম। একা যেতে হবে তাই নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই, কিন্তু কিছু ভয়ঙ্কর স্থান তা থেকে নিরাপদ থাকায় উত্তম। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান হলো লালদীঘি।

যাইহোক, যেহেতু বাসায় পৌঁছতে হবে তাই এইসব চিন্তা বাদ দিলাম এবং কানে একটি হেডফোন গুঁজে দিয়ে নিজের মতো গান শুনতে শুনতে পথ চলা শুরু করলাম। হঠাৎ করে মনে হল, আমার চারপাশের পরিবেশটা ঠাণ্ডা হয়ে উঠলো, কেউ যেনো আমার পিছন পিছন আমাকে অনুসরণ করছে। কখন যেন চলতে চলতে লালদীঘি মাঠে হাঁটছি। এই লালদীঘি নিয়ে রয়েছে শতাধিক ঘটনা।

দাদুর কথা বলার পরে ঘটনাগুলি মনে পড়ে যায়। একদিন দাদু বিকেল বেলায় লালদীঘির পাশ দিয়ে বাজার করে ফিরছেন। ঠিক তখন পথমধ্যে বিশাল দেহী মানুষের সঙ্গো দেখা; কিন্তু মানুষ বলে মনে হয় না। সেই বিশাল দেহী পথে দাঁড়িয়ে দাদুর দিকে মুখ করে কর্কশ গলায় বলে উঠেন, তোর শরীরের রক্ত চাই।

দাদু শান্ত হয়ে বলেন এত বড়ো সাহস আয় দেখি কে কার রক্ত খায়। তাদের মধ্যে মারামারি হয়। দাদু মারামারি করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরের দিন তাকে দীঘির মাঠে অর্ধমৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

বিষয়গুলো নিয়ে যত চিন্তা করছি ততই শিউরে উঠছি, শুধু ভাবছি আর প্রার্থনা করছি, আমার পথ আগলে যেন সেই বিশালদেহীর আবির্ভাব না হয়।

গল্প হলেও সত্যি

সৌরভ সরকার (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

গতকাল আমি ও আমার কিছু বন্ধু মিলে সুন্দরবন ভ্রমণে গিয়েছিলাম। বর্তমান শারদোৎসবের নবমী পূজার দিন। আমার ছয় বন্ধু — রাজস্বী, দীপায়ন, শুভদীপ, রাজদীপ, সৌমেন, শুভম। সকলে মিলে সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড অ্যানিম্যাল পার্ক বোট ঘাট থেকে যন্ত্রচালিত একটি বোট একদিনের জন্য ভাড়া করেছিলাম। নিয়ম মত ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে নদীতে ঘুরবার অনুমতি পত্র সংগ্রহ করলাম। উদ্দেশ্য ছিল হেরোভাঙা নদী পার হয়ে বিদ্যাধরী নদী অতিক্রম করে টাইগার রিজার্ভ ফরেস্টের দোবাকি ক্যাম্প, সজনেখালি এবং সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের বনি ক্যাম্প, কলস ক্যাম্প, বুড়ির দাবড়ি, দেউল বাড়ি টুরিস্ট স্পট ঘুরবো এবং আনন্দ করবো। সকলের সিদ্ধান্ত একমত হয়ে আমরা সকালের ব্রেকফাস্ট, দুপুরের লাঞ্চ করার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে ঝড়খালির ঘাট থেকে বোট ছাড়লাম। প্রচন্ড খরস্রোতা বিদ্যাধরী নদী পেরিয়ে দোবাকি ক্যাম্প-এ পৌঁছালাম। আনুমানিক সকাল ১০টা নাগাদ আমরা দোবাকি ফরেস্ট ক্যাম্পে নেমেছিলাম। আমাদের মত অনেক টুরিস্ট তাদের নিজ নিজ ফ্যামিলি এনেছিল এবং ঘুরে ঘুরে দেখছিল।

আমি সুন্দরবনের ছেলে। জন্মসূত্রে এখানকার বন, জঙ্গল, নদী স্রোতের ভয় আমরা তোয়াক্কা করি না। ফরেস্ট ক্যাম্পগুলি ঘুরবার জন্য আমাদের যথারীতি পাস করা ছিল। আমরা যেই মাত্র দোবাকি ক্যাম্পে অবতরণ করলাম দেখতে পেলাম কয়েকজন টুরিস্ট আমাদের সামনে থেকে একটু ডান দিকে নিচে নেমে গিয়ে হেতাল গাছের মাতি তুলতে শুরু করেছে। হেতাল শাঁস খেতে মিষ্টি। বাবা-মা ও একটি ছোট্ট মেয়ে সম্ভবত দশ বছর বয়স তারাও হেতাল শাঁস খেতে নিচে নেমেছিল।

ঠিক সেই সময় হেতাল ঝোপের মধ্য থেকে একটি বাঘ লাফ দিয়ে ছোট্ট মেয়েটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমাদের চোখের সামনে মেয়েটিকে টেনে বাঘটি ঝোপের মধ্যে চলে গেল। আমরা সাত বন্ধু, বীরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং উচ্চস্বরে চিৎকার করতে লাগলাম। বাঘ আমাদের এগিয়ে যাওয়ার গতি দেখে ভয়ে মেয়েটিকে কামড়ে দিয়ে ছুটে পাশের ঝোপে পালালো। আমরাও মরিয়া। খালি হাতে ঝোপের উপর পিটাপিটি করতে লাগলাম। সম্ভবত বাঘটি গোপনে পালিয়েছিল।

পিছন ফিরে দেখলাম ছোট্ট মেয়েটির বাবা-মা ভয়ে কাঁপছে। আমি দ্রুত ছুটে গিয়ে মেয়েটির সামনে এসে বসলাম এবং তাকে কোলের উপর তুলে নিলাম। দেখলাম অঝোরে রক্ত ঝরছে এবং বাঘের কামড় তার ঘাড়ে।

সম্ভবত মেয়েটি বাঁচবে না। মেয়ের মা অজ্ঞান হয়ে গেছে। আমার বন্ধুরা মেয়ের মাকে সুস্থ করতে

ব্যস্ত। মেয়েটিকে আমার কোলে শোয়াতে মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলল — "দাদা আমাকে বাঁচাও।" আমার বেপরোয়া অদম্য বলিষ্ঠ সাহস তার কান্না মিশ্রিত কথায় আমি উত্তরে বললাম "ভয় নেই বোন আমি আছি। আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তোকে বাঁচাবো।"

ভ্রমণ করা হয়নি, বোটের মাঝিকে বললাম "নৌকা ঝড়খালি ঘাটে ফেরাও।" আমাদের সঙ্গে মেয়েটির বাবা-মা। সেই দিন দোবাকি ক্যাম্পের কত টুরিস্ট হাজির হয়েছিল এবং সকলে বাহা-বাহা প্রশংসা করছিল। সাবাস ছেলে, সাবাস তোর বীরত্ব। সকল মানুষের প্রশংসা মাথায় রেখে ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলাম।

আমার অজ্ঞাতে তরুণ তাজা হাতে সাহসিকতার সঙ্গে কার্যফলক নিক্ষেপ করে এগিয়েছিলাম। আমি বলবান, সাহসী, জল-জঙ্গল, বাদাবন, খরস্রোতা বিদ্যাধরী নদী, বাঘ-কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম — "আমার কোন বোন নেই, এই ছোট্ট মেয়েটি যখন আমাকে দাদা বলে সম্বোধন করেছে, তখন আমি তাকে বাঁচাবোই।" মেয়েটির জীবন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার মুহূর্ত, আর আমার অদম্য সাহসিকতা। মেয়েটিকে বাঁচাবার প্রচেষ্টা আমাকে একটি জীবন সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় ফেলেছিল।

বন্ধুদেরকে শক্ত হতে বললাম, মাঝিকে বললাম "খুব তাড়াতাড়ি ঝড়খালি গ্রামে চলো, তারপর হাসপাতাল।"

যথারীতি হাসপাতালে ভর্তি করলাম। বাকরুদ্ধ মেয়েটি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছিল। আর আমার সাহসিকতা তরুণ বলিষ্ঠতা যেন প্রতি মুহূর্তে আমাকে হারিয়ে ফেলছিল। আমি ভেঙে পড়িনি, গ্রামে ফিরে এসে হাসপাতালে ভর্তি করলাম। তারপর বলল "বাঁচবে না"। কিন্তু বাঁচাতে তাকে হবেই। দীর্ঘ চারদিন, তিনরাত হাসপাতালে বসে তার বাবা-মাকে সাহস দিলাম। পঞ্চম দিনে মেয়েটি চোখ মেলে তাকালো। মৃত্যুকে হারিয়ে আমাদের জয় হল। এ যেন বোনের একটি নতুন জীবন ফিরে পেলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাতদিন পর বন্ধুদের নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

দাম্পত্য

দীপজ্যোতি দে (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

দক্ষিণ কলকাতার স্বনামধন্য ব্যবসায়ী শ্রী রতন কুমার সাহা যার ব্যবসার দাপটে কলকাতার ব্যবসার বাজারে নবউদ্ভূত ব্যবসায়ীরা প্রায় রীতিমত থতমত খায়। যেমন তার বৈষয়িক বুদ্ধি, রসগ্রাহী কথাবার্তা তেমনি আবার ব্যবহার সৌজন্যে এই মানুষটির প্রায় জুড়ি মেলা ভার। এই রতনবাবু যেমন সকলের মনজয়কারী তেমনি আবার তার শত্রুরও অভাব নেই এই শহরে। কলকাতার এই সুপ্রসিদ্ধ অঞ্চলে এই লোকটির বসবাস। এককথায় বলতে গেলে নিপাট ভদ্র এই লোকটির স্থানীয় অঞ্চলে বেশ সুখ্যাতি রয়েছে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ রতনবাবু সামাজিক বিবিধ ক্রিয়াকলাপ, অনুদান, সাহায্য ইত্যাদি সকল কিছুই করে থাকেন; তাই হয়তো স্থানীয় অঞ্চলে এই মানুষটির যথেষ্ট প্রভাব ও অনেকের কাছেই তিনি ভালোবাসারও পাত্র বটে।

খুব ছেলেবেলায় পিতৃবিয়োগ ঘটলে মাকে নিয়ে একাকী মাত্র ১৭ বছরের এই ছেলেটি বাবার ব্যবসার জোয়াল নিজের কাঁধে তুলে নেয় এবং ব্যবসার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে দিনে দিনে। বাবার সৃষ্টি ছেলের হাতে পড়ে যেন আরো ফুলে ফেঁপে ওঠে। ব্যবসা নতুন রূপ পেয়ে আরো দীর্ঘায়ত হয়। দয়াবান, স্নেহপরায়ণ এই রতনবাবু যেন এখন ব্যবসা ব্যতীত অন্য কিছুই জানে না বোঝে না। তার ধ্যানজ্ঞান এখন শুধুই এই যে আরো কীভাবে এই ব্যবসাকে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। এদিকে নিজের জীবনের প্রতি উদাসীন এই রতনবাবু ধীরে ধীরে ২৭ বছর অতিক্রম করে ২৮শে পা দিয়েছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাই ব্যবসায়িক বুদ্ধির প্রখরতাময় দিকপাল ইনি। তার প্রখর বুদ্ধির হেতু এলাকার নামধারী ব্যক্তিগণ তার সঙ্গে সর্বদা বন্ধুতার সম্পর্ক রেখে চলে। রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক কোনো অনুষ্ঠানের উদ্বোধন, বিচিত্রানুষ্ঠান সর্বত্রই এই মানুষটির উপস্থিতি যেন সকলেরই কাম্য। সবমিলিয়ে রতনবাবুর প্রভাব স্থানীয় এলাকার সর্বক্ষেত্রেই বেশ যথেষ্টই।

এদিকে মা গিরিবালা ছেলেকে নিয়ে চিন্তিত। এত ব্যবসা, প্রাচুর্য, কষ্টার্জিত অর্থ ও সঙ্গে ছেলের ক্ষতির আশঙ্কায় মা গিরিবালা সর্বদাই যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তিনি এবার নিজে সিদ্ধান্ত নেন, তার ব্যবসাপাগল ছেলেকে বিয়ে করিয়ে ঘরে একটি টুকটুকে সুন্দরী বৌ এনে পাগল ছেলেকে সংসারী করতে হবে। ঘরে নতুন বৌ এলে তার ছেলে একটু সাংসারিক হবে, ছেলেকে দেখে শুনে তার পাশে থাকবে এবং গিরিবালার সবসময়ের সঙ্গীনি হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যেই ঘটকের সঙ্গে আলোচনা করে তার বিবাহযোগ্য ছেলের জন্য গেলেন উপযুক্ত সুপাত্রীর সন্ধানে। একটির পর একটি পাত্রী দেখলেন গিরিবালা, সবশেষে পছন্দ হলো ৩ নম্বর পাত্রীটিকে। নাম কমলা, গায়ের রং ফর্সা, সুশ্রী, আয়ত নয়নের অধিকারিণী, মেঘের মতো ঘন কালো চুল, সর্বসুলক্ষণযুক্তা ঘরোয়া। চিন্তিত মা গিরিবালা। তার পছন্দ হলেও এই মেয়েটিকে তার ছেলের পছন্দ হবে কিনা সে বিষয়ে। যদিও মধ্যবিত্ত বাড়ির এই মিষ্টি মেয়েটিকে তার যে ভারী পছন্দ।

সংসার সম্পর্কে উদাসীন বিয়ে প্রসঙ্গে নারাজ ছেলে রতন এবারে আর মায়ের কথা ফেলতে পারে না বিয়েতে রাজি হয় সে। যথাকালে সমস্ত নিয়মরীতি মেনে রতনবাবুর সঙ্গে বিয়ে হয় কমলার। এখন গিরিবালা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত। কমলা এখন যে তারই সংসারের গৃহলক্ষ্মী। কমলাও বৌ হিসেবে যথেষ্ট ভালো হয়েছে। শাশুড়ি ও স্বামীর যত্নের কোনো ত্রুটি সে রাখে না। সংসারের সকল দিকেই তার সমান নজর। এমনি ভাবেই দিন কাটে।

কিন্তু হঠাৎই যেন সুখের আকাশে ভেসে আসে কালো মেঘের ঘনচ্ছায়া। ব্যবসার জগতের কিছু উঠতি মানুষ হিংসান্বিত হয়ে গোপনে ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে রতনবাবুর বিরুদ্ধে। অফিসে যাবার পথে প্রবল দুর্ঘটনার সামনে ফেলে তারা রতনকে। এমন বিপদকে বুঝতে না পেরে রতনবাবু এই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দুটো পায়ে সারাজীবনের মতো চলার সকল শক্তি হারিয়ে ফেলেন। যথাক্রমে ব্যবসায় আসে প্রবল মন্দা, ভাগ্যলক্ষ্মীর তীব্র কটাক্ষে রতনবাবুর সংসারে যেন দুর্ভাগ্যের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। গিরিবালা এমন পরিস্থিতি দেখে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে শুধুমাত্র নিজের ছেলেকে সুস্থ করায় তৎপর হয়ে পড়েন। এদিকে মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়ে কমলা এতো ব্যবসা, সম্পত্তি সে কখনো চোখে দেখেনি তা নাড়াচাড়া করা তো তার কাছে দুরস্থ। অথৈ জলে পড়ে সেও। কমলা বুঝতে পারে না এমতাবস্থায় তার ঠিক কি করণীয়?

এ দিকে শাশুড়িকে সামলায় সে আর অপরদিকে সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য প্রতিনিয়ত তার স্বামীকে মনে বল জুগিয়ে চলে সে। এমন অবস্থায় রতনবাবুর এমন বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে তার অফিসের দুই কর্মচারী রীতিমত ব্যবসার টাকা তছরুপ শুরু করলে কোনো ভাবে অন্য এক কর্মচারী মারফত তা জানতে পারে কমলা। এবার তার ঘুরে দাঁড়ানোর পালা। সংসারকে এক হাতে সামলে এবার অন্য হাতে ব্যবসাকে নিজ হাতে তুলে ধরার উপযুক্ত সময় এসে উপস্থিত হয়েছে বলে মনে করে কমলা। সংসারকে বাঁচানোর সঙ্গে স্বামীর তিলতিল করে বাড়ানো কাজকে বাঁচানো তার দায়িত্ব কারণ সে যে কমলা। তার সমস্ত শুভত্ব দিয়ে এই সকল কিছু সে রক্ষা করবেই। স্বামী ও শ্বশুরের এমন সাধের সৃষ্টিকে এবং শাশুড়ির সংসার এই দুটোর কোনোটিকেই সে ভেসে যেতে দেবে না; প্রয়োজনে সবটা নিজে দেখাশোনা করবে বলে মনস্থির করে কমলা। নিয়মিত চিকিৎসকের কথামতো স্বামীকে সেবা-শুশ্রুষা করে, সঙ্গে শাশুড়ির প্রতি তার যত্নে নেই কোনো অবহেলা। আর সে বুঝে নেয় ব্যবসার সকল দায়িত্ব। বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন হাতছানি আসে তার সম্পত্তি ও ব্যবসা গ্রাস করার জন্য, দুঃসময়ের সুযোগ নেয় অনেকে কিন্তু কমলা নিজের বুদ্ধিমত্তার কৌশলে সেই গ্রাস প্রতিহত করে। একদিকে ব্যবসা ও একদিকে সংসার এই দুই নিয়ে তীব্র লড়াই চালায় কমলা। এমন সময় পরিস্থিতি বুঝে এক আত্মীয় রতনবাবুর সব সম্পত্তি ও ব্যবসা নিজের নামে করিয়ে নেওয়ার দুর্বুদ্ধি দেয় কমলাকে। কিন্তু কমলা এসবে কান না দিয়ে নিজ লক্ষ্যে অবিচল। লড়াই চালায় কমলা। হার স্বীকার করে নেওয়ার মেয়ে সে নয়। এভাবে দিন চলতে থাকে। কমলা যেন স্বয়ং দশভুজা রূপে দশ হাতে দশ দিক আলো করে সবকিছু ধারণ করে রয়েছে। ধৈর্য্যের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় কমলা।

পুনরায় দুর্ভাগ্যের আকাশে যেন সৌভাগ্য লক্ষ্মীর উদয় হলো। কমলার স্বামী আগের তুলনায় অনেকখানি সুস্থ হয়ে ওঠে এবং আবার তার ব্যবসা জগতে পুনরায় প্রবেশ করে। এতদিন কমলা যে দায়িত্ব সামলেছে তা আবার রতনবাবুকে সব বুঝিয়ে দেয়। ইতিমধ্যেই রতনবাবুর ব্যবসা কমলার দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতে পৌঁছেছে এই সুসংবাদ কমলা নিজের মুখে রতনবাবুকে দেয়। খুশিতে অশ্রুসজল হয়ে ওঠেন তিনি। সন্তানের মতো করে একটু একটু করে প্রতিপালন করা ব্যবসা আজ ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গময়তার রূপ পেয়েছে এবং তা সম্ভব হয়েছে স্ত্রী কমলার সহযোগিতার স্পর্শে। শাশুড়ি গিরিবালা বৌমাকে খুশি হয়ে আশীর্বাদ করে বলেন সে সত্যিই সার্থকনামা। এছাড়া গিরিবালা কমলার সামনেই তার ছেলে রতনকে বলেন যে, সে অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে যখন ব্যবসায় প্রবল থেকে প্রবলতর হাতছানি আসে নানা প্রলোভন আসে তখন কী করে কমলা তা নিজের দক্ষতায় সামলে রেখেছে এবং সর্বাগ্রে নিজে দৃঢ় থেকেছে। আজ চাইলে সে সবটাই নিজে আত্মসাৎ করতে পারতো কিন্তু কমলা তা মোটেও করেনি বরং রতনবাবুর প্রতি ভালোবাসা, সংসারের প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্য এবং তার চারিত্রিক দৃঢ়তা-র কাছে যেন সকল কিছুই হার মেনেছে যা কমলার অগোচরে লক্ষ্য রেখেছিলেন শাশুড়ি গিরিবালা। তিনি বলেন যে, জীবনের দুঃসময়ে অসুস্থ স্বামীকে ফেলে সকল সম্পত্তি নিয়ে তাদের সংসার ছেড়ে সুযোগ বুঝে কমলা চলে যেতে পারতো; কিন্তু তা সে করেনি, করতে পারেনি, তার শিক্ষা ও সহবতে সে আটকে গেছে এবং সঙ্গে আছে ভালোবাসার অটুট বন্ধন। এটি যেন কমলার সততার পরীক্ষা যে মূল্যায়নে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে তার পুত্রবধূ কমলা। গিরিবালা সিদ্ধান্ত নেয় যে এই ব্যবসায় তাই শুধু রতন নয় বরং এখন থেকে কমলারও সমান অধিকার তাদের ব্যবসায়। রতন সম্মতি জানায় এবং এখন থেকে একসাথে শুরু হয় তাদের পথ চলা, তাদের নতুন জীবন।

ধীরে ধীরে কমলার যত্নে রতন আরো সুস্থতা লাভ করে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে ব্যবসা দেখাশোনা করে, ব্যবসা দ্রুত সম্প্রসারিত হয়।

এরপর কেটে যায় ১০ বছর, কমলার কোল আলো করে আসে আরো এক ছোট্ট কমলা। গিরিবালার সংসার পূর্ণতা পায়। আনন্দে খুশিতে তাই সুখী গৃহকোণ। রতন-কমলার দাম্পত্য যেন আরো শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়ে। কমলা নামের সার্থকতা উপলব্ধি করে রতন। সুখে-শান্তিতে জীবন কাটে রতন ও কমলার। গিরিবালা ছেলে-বৌ-এর সংসারজীবন দেখে শান্তি পায়।

সম্ভাবনা

সঞ্জয় বেরা (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

'LUDO' — এই নামটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। এটি একটি জনপ্রিয় ঘরোয়া [Indoor game] খেলা। এটি এক-এর অধিক খেলোয়াড় নিয়েই খেলা সম্ভব। এই খেলাটি খেলার সময় লুডোর দান (যেমন — ছক্কা [6], পুট [1], পাঞ্জা [5] প্রভৃতি) নিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের সকলেরই একটি প্রত্যাশা থাকে এবং সেই আশা পুরণ হলেই আনন্দের আর শেষ থাকে না।

একদিন খেলাটি চলাকালীন একজন দর্শক কয়েকটি বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন এবং বলেন এখন ছক্কা [6] পড়ার সম্ভাবনা 50% অথবা পুট [1] পড়ার সম্ভাবনা 80%। এখন, প্রশ্ন হল — কিসের ভিত্তিতে তিনি এটি অনুমান করলেন এবং কিভাবে করলেন।

'সম্ভাবনা' হল গণিতের ই একটি অংশ, যা অ-দূর ভবিষ্যৎ ঘটনার ফলাফল প্রকাশ করতে সাহায্য করে। এটি একটি নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করে। আমরা প্রতিনিয়তই 'সম্ভাবনা' শব্দটি ব্যাবহার করে থাকি। যেমন — লুড়োর গুটি চালানো হলে 'ছয়' পড়ার সম্ভাবনা, যত্রতত্রভাবে ফেলে রাখা তাসের মধ্যে থেকে একটি কার্ড নিলে তা টেক্কা হওয়ার সম্ভাবনা কতটা, আজ বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি রয়েছে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্ভাবনার দ্বারস্থ হতে হয়, যখন আমরা জানি না যে, কোনো কাজের ফলাফল কি হবে!

প্রায় প্রতিদিন আমরা সকলেই আবহাওয়ার যে পূর্বাভাস পেয়ে থাকি আবহাওয়াবিদরা এই পূর্বাভাস প্রদানের ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা ব্যবহার করে থাকেন। অতীত ও বর্তমান সময়ের পরিবেশের তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্যতার সাহায্যে আগামী দিনের তাপমাত্রা (এবং বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, শৈত্যপ্রবাহ, তুষারপাত প্রভৃতি) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ ঃ কোনো জায়গার কোনো একদিনের বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা 60% অর্থাৎ ওই জায়গায় ওই সময় 100 দিনের মধ্যে 60 দিন বৃষ্টিপাত হয়েছে। আর এই পূর্বাভাস শুনে আমরা আমাদের কাজের জন্য বাইরে বেরোতে হলে Rain-Coat, ছাতা বা বৃষ্টি থেকে বাঁচতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি। আমরা সকলেই আমাদের মোবাইল ফোনে আবহাওয়ার প্রতিবেদনে [Weather Report] এই সমস্ত চিত্রগুলি দেখে থাকি।

এখানে মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার সম্ভাবনা = 4/5

একই ভাবে কোচ এবং খেলোয়াড়গণ সম্ভাব্যতার সাহায্যে ভালো ফলাফলের জন্য পূর্বপরিকল্পনা করে থাকে। এখজন ব্যাটস-ম্যান টানা 16টি ম্যাচে 6টি অর্ধশতক এবং 2টি শতক করলে পরবর্তী ম্যাচে তার ব্যাটিং দক্ষতা সম্ভাব্যতার সাহায্যে নির্ণয় করে কোচ তাকে প্রয়োজন অনুসারে মাঠে খেলার সুযোগ প্রদান

করবেন। আবার, একজন সুদক্ষ ফুটবলার যদি পুরো সিজনে 15টি পরিকল্পিত শটের মাধ্যমে 5টি গোল করতে পারে পরবর্তী ম্যাচে তার গোল করার সম্ভাবনা দাঁড়ায় 66.67%।

আবার কোনো অনুষ্ঠানে আমরা কি পরে যাব। তা নিয়ে আমরা কম-বেশি সকলেই দ্বিধাগ্রস্ত থাকি। কোন পোশাকটা ওই অনুষ্ঠান এবং আমাদের নিজেদের সঙ্গে মানান সই সেই অনুযায়ী আমরা নিজেদের জন্য পোশাক বাছাই করে থাকি।

আরো নানা ক্ষেত্রে আমরা সম্ভাবনার সাহায্য নিয়ে থাকি, যখন আমাদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমাদের সামনে নানা সমস্যা আসে এবং তখনই আমরা সম্ভাবনার সাহায্য নিই। কারণ আমাদের অবচেতন মন আমাদের এত কিছু ভাবার আগেই Probablity ব্যবহার করে আমাদের অজান্তেই বহু সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যা আমরা বুঝতেই পারি না।

দেহ দান.....

রাহুল দাস (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

স্মৃতিধারা তোমার হবে না ম্লান
তুমি করেছ দেহ দান,
পুণ্য কাজে লেগেছ তুমি,
এ বসুন্ধরা শুধু তোমারই বঙ্গাভূমি।

কালো মেঘে ঢাকল তারা
হলে তুমি দিশেহারা,
ঘন ধোঁয়াশার আঁধার তলে,
প্রতিবাদী সত্তা তুমি, কোথায় গেলে?
করে গেলে সেই অবচেতন দেহটুকুও দান,
হায়রে! ডুকরে কেঁদে ওঠে এ ভঙ্গুর প্রাণ।

অন্তিমকালে সেই কারুণ্য ভরা চোখে
অপূর্ব স্বপ্ন ছবি রেখে,
গেলে হারায়ে, কোন কাননে?
অশ্রুধারা বাহিত হয় তন্দ্রালু নয়নে।

যুগ হতে যুগ যাবে বয়ে
রবে তুমি চির অমর হয়ে,
মোর অমোঘ মনিকোঠায় —
শূন্য হতে নিঃস্তব্ধতায়।

সুরভাষী ছন্দে আমাদের তৃপ্তি,
তুমি এ ধরণীর সোনালি সুন্দর দীপ্তি।
তোমার বিদায় সুরে নাই ভাষা, নাই শব্দ,
দেহের দহন দেহই আরব্ধ।

তুমি করেছ দেহ দান,
হবে না হবে না সে স্মৃতি ম্লান।

ভাইজ্যাগ ভ্রমণের আড়াই দিন

অভিম মণ্ডল (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

২০১৮ সালের ৩রা মার্চ আমার কাছে ছিল খুবই আনন্দের একটি দিন। কারণ, ঐ দিন আমরা সহপাঠীরা সকলে সমস্ত প্রস্তুতি সেরে আমার পূর্বতন কলেজ থেকে এস্‌কারসন-এর জন্য ভাইজ্যাগের উদ্দেশ্যে রওনা হই। এটি ছিল আমার প্রথম ট্রেনে চড়ে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোনো রাজ্যে ভ্রমণ, তাই আমি খুবই কৌতূহলী ছিলাম এই জন্য যে, আমি এমন কোথাও ভ্রমণে যাচ্ছি, সেই সাথে ফিল্ড সার্ভে করতে যাচ্ছি, সেখানকার মানুষের সংস্কৃতি, রীতিনীতি, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা আমাদের বাংলার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ ভারত বহু বৈচিত্র্যের দেশ; তবে আমার কাছে ছিল কৌতূহলের আর উৎসাহের।

আমাদের এই ভ্রমণটি ছিল মূলত পাঠ্যবিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্র সমীক্ষার উদ্দেশ্যে। তবে এত সুন্দর কোনো জায়গায় গেলে পরিশেষে ঘোরাঘুরিটাই মুখ্য বিষয় হয়। যাইহোক আমরা সবাই সকাল সকাল হাওড়া স্টেশনে এসে একত্র হলাম, সেই দিন আমাদের প্রত্যেকের বাবা-মায়েরা এসেছিলেন আমাদের বিদায় জানাতে। হাওড়া থেকে বেলা এগারোটা-পয়তাল্লিশের ইস্টকোস্ট এক্সপ্রেস রওনা দিল বিশাখাপত্তনম-এর উদ্দেশ্যে। আনন্দ উৎসাহের মধ্য দিয়ে মাত্র কয়েকদিনের জন্য বাড়ি থেকে দূরে কোথাও যাওয়া, তবুও কেন জানিনা মনে মনে একটা চাপা কষ্ট অনুভব হচ্ছিল বাবা-মাকে ছেড়ে যেতে। আমি শুধু ট্রেনের দরজা দিয়ে চেয়ে ছিলাম ওনাদের দিকে আর ধীরে ধীরে ট্রেনটির গতি বাড়ছিল। অবশেষে সবকিছু মিলিয়ে গেল বিলয়বিন্দুতে। ট্রেনের মধ্যে বন্ধুদের সাথে খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা-গল্প দারুণ জমেছিল। আমাদের বিভাগের শ্রদ্ধেয় স্যারের সাথে অনেক বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল। এরই মধ্যে জানালার বাইরে চোখ পড়তেই খেয়াল করি ছুটে যাওয়া স্টেশনগুলির নাম 'ওড়িয়া' ভাষায় লেখা আর দেখা মাত্রই খুব উৎসাহের সাথে স্যারকে বলি আমরা ওড়িশায় প্রবেশ করেছি স্যার আর বলা মাত্রই উনি আমার উৎসাহ দেখে মৃদু হেসে বলেন হুম.....! আরও যত যাচ্ছি দেখছি সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। জানালা দিয়ে দেখলাম সেখানকার মন্দিরগুলির গঠনগত শৈলি আমাদের বাংলা থেকে কত আলাদা, মন্দিরগুলির দেওয়ালে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি চিত্র ইত্যাদি। এইসব দেখছি আর ট্রেন ছুটে চলেছে সময়ের সাথে। রাতে ঘুম তেমন আসেনি কারণ, ট্রেনটি নাকি চিল্কা হ্রদের পাশ দিয়ে ছুটবে সেটি দেখার আশায়। তবে রাতের অন্ধকারে তা আর চোখে পড়েনি। অবশেষে পরদিন ভোর পাঁচটা নাগাদ আমরা গিয়ে পৌঁছলাম বিশাখাপত্তনম স্টেশনে। আঠারো থেকে কুড়ি ঘন্টার যাত্রায় সবাই প্রায় ক্লান্ত তবে উৎসাহের একফোঁটাও কমতি নেই কারোর মধ্যে। স্টেশনের বাইরে এসে দেখি একটি টুরিস্ট বাস আমাদের জন্য

অপেক্ষমান, একটি ট্যুর-ট্রাভেলস্ এজেন্সি আমাদের এই আসা-যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থাপনাটি করেছে। সেই বাসে করে হোটেলের পথে যেতে যেতে দূরে এক পর্বতমালার সারি চোখে পড়ে, এটি পূর্বঘাট পর্বতমালার অংশ বিশেষ। ও, এটা বলা হয়নি ভ্যাইজ্যাগ শহরটি পূর্বঘাট পর্বতমালা ঘেষা বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত উপকূলীয় শহর। এর মধ্যেই সহপাঠীরা সবাই বলা-কওয়া শুরু করল "আমরা এখন ওই পাহাড়গুলো থেকে কতটা দূরে আছি।" আমরা কোনো পাহাড়ে উঠব কিনা ইত্যাদি আরও নানা কথা বলতে বলতে আমরা পৌঁছে গেলাম হোটেলে। রিসেপশনে চেক-ইন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে, শুরু হল কে কোন ঘরে থাকবে তা নিয়ে আলোচনা, এই কাজটি আমাদের মাননীয় স্যার খুব সুন্দর ভাবে ব্যবস্থা করলেন, এমন ভাবে যাতে সবাই আনন্দে থাকে। তবে, খুব কম সময়ের জন্য আমাদের এই ভ্রমণটির আয়োজন করা হয়েছিল। অতএব আমাদের ঘোরাফেরা শুরু করে পরবর্তীতে আমাদের সিলেবাস অনুযায়ী সীমানাভিত্তিক কাজ সবই দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। তাই হোটেলে পৌঁছেই সবাই ফ্রেস হয়ে সকালের জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ি ভাইজ্যাগ শহরের দর্শনীয় স্থানগুলি পরিদর্শন করার জন্য। "ওই যে, পরিশেষে ঘোরাঘুরি টাই মুখ্য বিষয়।" আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল সিমাচলম মন্দির। এটি বিশাখাপত্তনমে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে তিনশো মিটার উপরে সিমাচলম পর্বত রেঞ্জে অবস্থিত। এই মন্দিরের আরাধ্য নৃসিংহদেব। বিষ্ণুর দশ অবতারের একজন হলেন নৃসিংহ অবতার। যার মুখটি সিংহের মতো এবং দেহ মানুষের মতো। পুরাণ মতে তেরো শতাব্দীতে ওড়িশার পূর্ব গঙ্গার রাজা নাঙ্গুলা নরসিংহদেব প্রথম দ্বারা কলিঙ্গ স্থাপত্য অনুসারে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটিতে কলিঙ্গ স্থাপত্য এবং দ্রাবিড় স্থাপত্য উভয়ই দেখা যায়। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল শিবাজি পার্ক। জায়গাটি খুবই মনোরম। বাহারি ফুলগাছসহ গোছানো সুন্দর একটি স্থান যার জন্য আমার সহপাঠীদের কারোর ছবি তোলাতেও কোনো কার্পণ্য ছিল না। সেখান থেকে আমরা ফিরলাম হোটেলে দুপুরের স্নান-খাওয়া সেরে সামান্য বিশ্রামের জন্য। তারপর আবার বেরিয়ে পড়লাম আরও কিছু স্থান পরিদর্শনের জন্য। যে ট্যুর-ট্রাভেল এজেন্সি আমাদের ভ্রমণ ব্যবস্থাপনাটি করেছিল তাদের কথা না বললেই নয়, তাদের পরিবেশন ছিল খুবই ভালো। এবার আমরা গেলাম থ্রি-টেম্পল দেখতে। সেখানে তিনটি চমৎকার পাহাড় রয়েছে, যার প্রত্যেকটির বিশেষ ধর্মীয় তাৎপর্য আছে। যেটি সামাজিক সম্প্রীতি আর ভাইজ্যাগবাসীদের শান্তিপ্রেমী চেতনার অনন্য সাক্ষী হিসেবে কাজ করে। 'দরগাহ কোণ্ডা' পাহাড়ে রয়েছে 'বাবা ইশক মদিনা দরগাহ'। এটি প্রায় সাতশো বছরের পুরোনো "শ্রীঞ্জামণি টিলাতে" রয়েছে ভেঙ্কটেশ্বর মন্দির' এবং সর্বোচ্চ পাহাড় 'রস হিল'-এ অবস্থিত রস হিল চার্চ, সেখান থেকে দক্ষিণে তাকালে দেখা যায় দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র। আমাদের ভাইজ্যাগ ভ্রমণের প্রথমদিনের শেষ গন্তব্য ছিল কৈলাশগিরি। সেখানে পাহাড়ের মাথায় একটা পার্ক আছে আর আছে শিব-পার্বতীর বিশাল মূর্তি। একটি বিশেষ ভিউ পয়েন্ট আছে, নাম 'টাইটানিক ভিউ পয়েন্ট'। জায়গায়টি অদ্ভূত সুন্দর। এখান থেকে সমুদ্র আর পাহাড়ের মেলবন্ধন একসাথে দেখা যায়, আর এটাই ভাইজ্যাগের বিশেষত্ব। স্থানটি ছবি তোলার জন্য ছিল অসম্ভব ভিড়ে ঠাসা। আমিও চেষ্টা করেছিলাম একটি ছবি তোলার।

কিন্তু ভিড়ের কারণে শেষমেশ ব্যর্থ হই। পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের দিকে তাকালে মনে হয় বিশাল নীল জলরাশি পাহাড় ঘেরা শহরটিকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে। এত সুন্দর দৃশ্য আমি আগে কখনও দেখিনি। তাই মুগ্ধ হয়ে চেয়েছিলাম খানিকক্ষণ। বিনোদনের জন্য কৈলাশগিরিতে ছিল পার্ক, মিউজিয়াম, ট্রয়ট্রেন ইত্যাদি সমস্ত কিছু। তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, আমরা আবার হোটেলে ফেরার পথে। সেখানে ফিরে আমাদের পরের দিনের ভ্রমণ কর্মসূচীর প্রস্তুতি নিতে হবে। কারণ পরের দিন আমাদের আসল যে উদ্দেশ্যে এখানে আসা অর্থাৎ পাঠ্যবিষয়ের সিলেবাস ভিত্তিক যে ক্ষেত্র সমীক্ষা তার জন্য যেতে হবে আরাকুভ্যালির একটি গ্রামে। হোটেলে পৌঁছে মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা আমাদের বোঝালেন, কে কোন সমীক্ষার কাজটি করবে, সেই অনুযায়ী দল গঠন করে দিয়েছিলেন। আমি মনে মনে চাইছিলাম আমার যেন গৃহ ভিত্তিক সমীক্ষার কাজটি পড়ে, তবে আমি সেখানকার মানুষের সাথে কথা বলতে পারব। সত্যিই আমার মনের আশা পূরণ হল। ভিন্ন জায়গার মানুষের সাথে কথা বলতে আমি ভীষণ আগ্রহী ছিলাম। এটি ছিল আমাদের ভাইজ্যাগ ভ্রমণের দ্বিতীয় দিন। যথারীতি যাবার উদ্দেশ্যে আমরা ভোরবেলায় উঠে সবাই প্রস্তুত। ছ'টা-পয়তাল্লিশ-এর "কিরণভোলা এক্সপ্রেস" বিশাখাপত্তনম স্টেশন থেকে। ট্রেন যাত্রা শুরু করল, প্রায় তিন থেকে চার ঘন্টার পথ 'কু-ঝিক-ঝিক চলতে চলতে আমরা পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের রাজ্যে। কী দারুণ ছিল সেই অনুভূতি, পাহাড়ের গা বেয়ে ট্রেন ছুটেছে তার গন্তব্যের দিকে আর ক্ষণিক পর পর টানেল পার হচ্ছে। টানেলের ভেতর ঢুকলেই অন্ধকার আবার বেরুলেই রোদ ঝলমলে আলো যেন এক আলো-আঁধারির খেলা, ঠিক আমাদের জীবনের মতো। সবুজ উপত্যকার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ট্রেন কখনও থামছে একটু দম নেবার জন্য ছোট্ট স্টেশন গুলোতে আর গ্রামের নারী-পুরুষেরা কেউ কেউ বাদাম, ফলের ঝুড়ি সহ উঠছে বিক্রির জন্য। বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী হতে হতে এরই মধ্যে আমরা আরাকু স্টেশনে পৌঁছলাম। এটি এখানকার একটি হিল স্টেশন। সেখান থেকে সড়ক পথে যেতে হবে যেনদাপল্লিভালাসা গ্রাম, পথে যেতে যেতে একটা ভালো লাগা জিনিস চোখে পড়ল, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এখানকার নারীরা মাথায় ফুল বাঁধেন সৌন্দর্যের জন্য। এটি একটি দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতি। আমরা গন্তব্যে পৌঁছেই প্রথমে গেলাম পদ্মপুরম গার্ডেনে। এটা আরাকুভ্যালিতে অবস্থিত একটি বোটানিক্যাল গার্ডেন। গাছ-গাছালিতে ভরা সেই সাথে পাখির কলতান ও অসংখ্য প্রজাপতির ঝাঁক, কেমন সুন্দর তারা আনন্দে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখে মনে মনে খুব খুশি লাগছিল। এখানে অন্ততঃ তাদের উপর মানুষের হস্তক্ষেপ নেই। সেখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। আমাদের সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত গ্রামটি আদিবাসী অধ্যুষিত এবং এখানকার মূল ভাষা তেলেগু। তবে, ওড়িশা রাজ্যের সাথে সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় কিছু মানুষ ওড়িয়া ভাষা জানেন সমীক্ষায় জানতে পারলাম। ফলত গৃহভিত্তিক সমীক্ষার জন্য এটি ছিল আমাদের কাছে দারুণ একটি অভিজ্ঞতা। ভিন্ন ভাষা হলেও সেখানকার মানুষের বক্তব্য আর আমাদের কথার মাধ্যমে ভাব বিনিময় হওয়ায় আমরা কিন্তু পরস্পর অনেকাংশে বুঝতে পেরেছিলাম। বোধহয় এর জন্যই বলা হয় ভারতে ভাষা বৈচিত্র্যের ভিন্নতা

থাকলেও প্রত্যেক ভারতবাসীর মধ্যে একটা আত্মিক সম্পর্ক আছে। এখানে দেখার অন্যতম আরও একটি জায়গা ট্রাইবাল মিউজিয়াম। সেখানে আদিবাসীদের তৈরী বিভিন্ন রকম জিনিস তৈরী হচ্ছিল। ফেরার পথে দ্রষ্টব্য ছিল 'বোরাকেভ' গুহা। ভারতের বড় বড় গুহাগুলির মধ্যে এটা অন্যতম। এটি একটি চুনাপাথরের গুহা। 1807 সালে উইলিয়াম কিং এই গুহা আবিষ্কার করেন। এখানে চুনাপাথর দ্রবীভূত হয়ে পদ্মফুল, গনেশ, মাশরুম, কুমির ইত্যাদি কাঠামোতে বিকশিত হয়েছে। এই রূপগুলি পর্যটকদের কল্পনাকে ধরে রেখেছে। তবে, আমি ভূগোলের ছাত্র হিসেবে এই ভূমিরূপ গুলোকে স্ট্যালাকটাইট, স্ট্যালাগমাইট হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলাম। বোরাকেভের বাইরে প্রবাহহীন নদীখাত আর পাহাড় ঘেরা সবুজের প্রাচুর্য যে কাউকে মুগ্ধ করবে।

আমাদের ভ্রমণের তৃতীয় এবং শেষ দিন সবার মন ছিল ভারাক্রান্ত। "ইস আর একটা দিন যদি থাকতে পারতাম।" এই ভেবে তবে, প্রথমেই বলেছি — আমাদের এই ভ্রমণটি ছিল খুবই স্বল্প সময়ের। সেই সাথে যথাসম্ভব স্বল্প খরচের মধ্যে। দুপুরবেলা হাওড়াগামী চেন্নাই এক্সপ্রেসে ফিরতে হবে। তবে সকালের দিকে খানিকটা সময় তো হাতে আছে? তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক। সবাই মিলে চলে গেলাম 'রামকৃষ্ণ বিচ্'। এখানে মা কালীর একটা মন্দির আছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও আছেন। আমাদের সকলের শুধু সমুদ্রের জলে পা টুকু ভেজানোর অনুমতি মিলেছিল, তাই-ই সই।

ও এখানে আর যে বিষয়টি চোখে পড়ার মতো সেটা হল — এখানকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। সমস্ত শহরটিই ঝকঝকে, রাস্তায় গাড়ি চলেছে কিন্তু ট্রাফিক জ্যাম নেই, মানুষ আছে কিন্তু কোলাহল নেই, সব মিলিয়ে ভাইজ্যাক দারুণ উপভোগের জায়গা।

রামকৃষ্ণ বিচের সাবমেরিন মিউজিয়ামটিও কিন্তু রোমাঞ্চের বিষয়। এই সাবমেরিনটির একাত্তরের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এখানে দেখার আরও অনেকগুলি বিচ আছে। যেমন — ইন্দিরা গান্ধী জুলজিক্যাল পার্ক, বিশাখা মিউজিয়াম, এছাড়া কিছু প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপও আছে। বেশীরভাগ স্তূপ খুব সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব সেবার আর দেখা হয়নি, পরের বার গেলে অবশ্যই দেখবো।

যাইহোক, হোটেলে এসে চেক-আউট প্রক্রিয়া শেষ করে বিশাখাপত্তনম স্টেশনে পৌঁছে হাওড়া গামী চেন্নাই এক্সপ্রেসে চেপে বসলাম।

এবার যে, ঘরে ফেরার পালা।

লক ডাউন-এর ভ্রমণকথা

সৌরভ ঘোষ হাজরা (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

ভ্রমণ। শব্দটি শুনলেই মনের মধ্যে জেগে ওঠে এক অদ্ভুত উৎফুল্লতা। কিন্তু, লক ডাউন-এ ভ্রমণ! সত্যিই একটু অকল্পনীয়।

যাইহোক, আসল কথায় আসা যাক। সালটা ছিল ২০২০-র, ডিসেম্বর মাস। আর ডিসেম্বর মানেই শীতের আমেজ, জিঞ্জোল বেল গান, ঘুরতে যাওয়ার এক আদর্শ সময়।

তাই প্রায় দীর্ঘ ছয় মাস ঘরে বন্দি থাকার পর, পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হওয়ায় জীবনের প্রায় একরকম ঝুঁকি নিয়েই আমরা পাঁচ বন্ধু বেরিয়ে পড়েছিলাম অজানা এক পথে। প্রকৃতিকে আরও একবার খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করার আশায়।

গন্তব্যস্থল ছিল উত্তরবঙ্গের কিছু আকর্ষণীয় অফবিট জায়গা। নেট মাধ্যমে অনেক গবেষণা করার পর অবশেষে ঠিক হলো যাত্রার দিন ও থাকার জায়গা। সব মিলিয়ে এক দারুণ উত্তেজনার সাক্ষী হয়েছিলাম আমরা।

*** তাবাকোশী....**

কোন চিত্রকর যেন তাঁর শিল্পের প্রথম ছোঁয়া দিয়েছে এমনটাই মনে হয় তাবাকোশীকে দেখে। এখানে এলে মনের একটা আলাদা অনুভূতি হয়, যেন রঙ ঢেলে সাজিয়ে দিয়ে যায় মনটা।

প্রথম দিন ঃ তারিখ ১৯/১২/২০২০

হাতে দিন তিনেক সময় নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। সব কাজের ব্যস্ততা মিটিয়ে আমরা পাঁচ বন্ধু এক উইকেন্ডে রাত্রের একটা ট্রেনে চেপে পরদিন ভোর রাতে পৌঁছালাম এন জে পি [N J P] স্টেশন। এখান থেকে একটা অটো নিয়ে শিলিগুড়ি জংশন, তারপর এখানে একটু চা-এর সাথে টা সহযোগে রিফ্রেশ হয়ে মিরিক যাওয়ার একটা শেয়ার গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলা মিরিকের উদ্দেশ্যে। জনপ্রতি ভাড়া খুব একটা নয় ১৫০/- থেকে ১৭০/- টাকা মত। আমরা যদিও বাসে করেই মিরিক গিয়েছিলাম, ভাড়া পড়েছিল মাত্র ৮২/- টাকা। এন জে পি থেকে তাবাকেশী যেতে সময় লাগে প্রায় ঘন্টা তিনেক। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং মোড় পেরিয়ে গাড়ি মিরিকের রাস্তা ধরতেই রাস্তার দু দিকে সবুজের হাতছানি উপেক্ষা করা যায় না।

শুরুতে কিছুটা জঙ্গল তারপর চা বাগান, কালো পিচ রাস্তার বুক চিরে গাড়ি এগিয়ে চলেছে, কিছুটা সমতল পেরিয়ে রাস্তা পাহাড়ে উঠতেই এক অন্য ছবি, দূরের নীল পাহাড়গুলো কাছে এসে সবুজ চায়ের

বাগিচায় মুড়ে গেল, মনভরানো প্রকৃতি দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম মিরিক বাজার। এখনকার অন্যতম আকর্ষণ হলো মিরিক লেক, যার সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা একটু কষ্টসাধ্য।

এবার এখান থেকে আর একটা গাড়ি নিয়ে তাবাকোশী রওনা দেওয়া, জনপ্রতি ভাড়া ওই ৫০ থেকে ৬০ টাকা মত, আর পুরো গাড়ি নিয়ে গেলে ভাড়া পড়বে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকার মতো।

মন ভালো করা মিরিক লেক ও পাহাড়ি চা বাগানের শোভা দেখতে দেখতে মিনিট কুড়ির মধ্যে তাবাকোশী পৌঁছে যাওয়া যায়। এখানে বেশ কয়েকটা থাকার ব্যবস্থা আছে। আমাদের হোমস্টে টি [Tea Valley Homestary] নদী থেকে একটু উপরে গ্রামের ভেতর, এর চারপাশ চা-বাগানে ঘেরা আর নানান ফুলের গাছে সাজানো, ঠিক যেনো স্বপ্নের মতো। রুমগুলো বেশ বড়, বেশ বড় জানালা, বাইরে ছিল একটা সুন্দর বারান্দা। সেখানে থেকে বাইরের প্রকৃতি দুর্দান্ত। শুধু তাই নয়, আমাদের কটেজের বাইরে ছিল একটা উডেন ডাইনিং টেবিল, যা কটেজটির শোভা বাড়িয়ে তুলেছিল দ্বিগুণ। এখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় দুপুর। তাই বেশ খিদে পাওয়াটা স্বাভাবিক, এখানে ভাল করে স্নান সেরে মধ্যাহ্নভোজ টা সেরে নেওয়া যাক। এখানের খাবার বেশ ভালো, তৃপ্তি করে খাওয়া সারা হলো। একটু রেস্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়া পায়ে পায়ে গ্রামটা ঘুরে দেখার জন্য। প্রথমে হাঁটতে হাঁটতে চায়ের বাগানের দিকে ওখানে সফরসঙ্গী হলো কয়েকটা পাহাড়ি কুকুর। দুদিকে পাহাড়ের ঢাল বরাবর চা বাগান আর মাঝখান দিয়ে মন ভালো করা পথ।

আচ্ছা এই জায়গার নাম তাবাকোশী কেন?

এই জায়গার নাম প্রথমে ছিল গোপালধারা। ২০১৪ সালে এর নাম করা হয় তাবাকোশী। এখানে থাকার জন্য কিছু জায়গা তৈরীর চিন্তাভাবনা করা হয়, তখন থেকেই নামকরণের একটা ব্যাপার আসে। এখানের এই নামকরণের কারণ হলো একটি পাহাড়ি নদী। পাহাড়ের ঠিক মাঝখান দিয়ে এই নদীটি বয়ে গেছে, নদীর নাম রঙভঙখোলা, আবার এর নেপালি নাম তাম্বাকোশী।

এই নামের কারণ বর্ষায় নদীর জল কাদা মেখে তামাটে রং ধারণ করে তাই সেখান থেকে এসেছে তাম্বা শব্দটি, আর নেপালি ভাষায় কোশী শব্দের অর্থ হলো নদী, তাই নদীর নাম তাম্বাকোশী। তখন ওই নামেই এই জায়গার নাম রাখা হলো, সেখান থেকেই তাম্বাকোশীর পথ চলা। সেই তাম্বাকোশী লোকমুখে ধীরে ধীরে অপভ্রংশ হয়ে তাবাকোশী বলে খ্যাত হলো।

চা বাগান থেকে হেঁটে নিচের দিকে নামতে চোখে পড়ল একটা পাবলিক সুইমিং পুল। নদীর ধারে একটা বেশ সুন্দর পার্কও আছে, চাইলে এই জায়গায় টেন্ট-এ রাত কাটানো যায়। পার্কে নানান ফুলের গাছ রয়েছে, আছে সুন্দর বসার ব্যবস্থা, এখান থেকে চারপাশের ভিউ অসাধারণ।

এবার একদম নদীর কাছে নেমে আসা যাক। নদীতে খুব বেশি জল নেই তবে বর্ষায় রূপ দেখার মত। পাহাড়ী জলে রঙভঙখোলাতে স্নান করাও যায় খুব সুন্দর। রয়েছে একটা ব্রিজ, ব্রিজের উপর থেকে নদীর

ভিউ দারুণ, দূরে একটা শিব মন্দির রয়েছে হেঁটে পৌঁছে যাওয়া যায় সেখানে, মন্দিরের সামনে বসার জায়গাও আছে।

চোখ বন্ধ করে একবার ভাবুন তো সবুজে মোড়া চা বাগানের মাঝে সুন্দর একটি কটেজ, সামনে পাহাড়ি নদী, একটি পোড়ো শিব মন্দির, চারিদিকে পাখির গান ও ঠাণ্ডা শীতল মন ভালো করা হাওয়া। আহা, সে যেনো ঠিক স্বপ্নে দেখা কল্পনার মত।

এরপর ফিরে আসার জন্য হাঁটা শুরু, কারণ বেলা পড়ে আসছে আর শরীরটাও বেশ ক্লান্ত। তাই হোম স্টে তে ফিরে একটু রিফ্রেশ হওয়া, সঙ্গে কফি আর হালকা স্ন্যাক্স।

সারাদিনের পর শরীর বেশ ক্লান্ত তাই তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে ঘুমিয়ে পড়তে হবে আজ।

পরদিন সকাল সকাল উঠে চা খেয়ে হোমস্টে থেকে বেরিয়ে বাকি দিকগুলো ও গ্রামের আশপাশটা দেখে নিতে হবে। হোম স্টের পাশেই একটা টম্ব রয়েছে, চারিদিকে নানান পাখির ডাকে মুখরিত, নানান ফুল ও বিভিন্ন অর্কিড। সামনে রয়েছে একটা বসার মতো জায়গা, এখান থেকে পাহাড়ের ভিউ অনবদ্য। হোম স্টে থেকে কিছুটা দূরে একটা ভিউ পয়েন্ট আছে সেখান থেকে গ্রামের পুরোটা ও পাহাড়ের রূপ দেখে মন ভরে যায়, পাহাড় আর চা বাগান তার মাঝখান দিয়ে গাড়ি যাওয়ার রাস্তা।

তাম্বাকোশীর আনাচে-কানাচে রয়েছে কমলালেবুর বাগান। রয়েছে ভুট্টার ক্ষেত, এলাচের বাগান, আদার বাগান। এখান থেকে দূরে মিরিক টা দেখা যায় পাহাড়ের উপর, এখানে একটা ছোট্ট ঝর্ণাও আছে, তার পাশে এলাচ বাগানে টেন্ট এ রাত কাটানোর ব্যবস্থা আছে। চা বাগানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে ঘুরতে ঘুরতে দেখা যায় নানান পাখির আনাগোনা, চারদিকে সবুজের সমারোহ, উপরে চা বাগান থেকে নিচে রঙভঙ নদী ও মন্দির দেখতে দারুণ লাগে। এখানে এক জায়গায় No Hunting বোর্ড চোখে পড়ল, জানলাম এখানে মাঝে মধ্যে হরিণ চলে আসে জঙ্গল থেকে।

চাইলে খুব সকালে এখান থেকে গাড়ি নিয়ে টারজাম [Turzum] জায়গাটা ঘুরে আসা যায়। তাবাকোশী থেকে ৩০ মিনিটের পথ, সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, পুরোটা চা বাগানের মধ্যে দিয়ে।

যাইহোক, এবার এখান থেকে ফেরার পালা হোম স্টে তে। ব্রেকফাস্ট করে একটু রেস্ট নিয়ে, প্রি বুক করা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গোপালধারা, পশুপতি হয়ে লেপচাজগৎ-এর উদ্দেশ্য।

তবে, দুদিনের জন্য এই সফর বেশ বেশ মনোরম, নিভৃতে নিজের সঙ্গে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

*** লেপচাজগৎ.....**

পাহাড়ের কোলে মেঘে মোড়া একটি ছোট্ট মিষ্টি গ্রাম হলো লেপচাজগৎ। The Land's of Lepcha.

দ্বিতীয় দিন ঃ তারিখ ঃ ২১/১২/২০২০

প্রথম দিন তাবাকোশী তে একটি সুন্দর দিন কাটানোর পর আজকে আমাদের গন্তব্য লেপচাজগৎ। প্রি বুক করা গাড়ি নিয়ে আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম লেপচাজগৎ-এর উদ্দেশ্যে। পথে যেতে যেতে দেখে নিলাম সবুজ চাদরে মোড়া চায়ের বাগান যার নাম হল Gopaldhara Tea Estate। এখানকার মনোরম আবহাওয়া ও শান্ত পরিবেশ, সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব দৃশ্য যেন নিমেষেই দূর করে দিল মনের সব ক্লান্তি। কচি কচি চা পাতার মিষ্টি গন্ধ যেন বাতাসকে করে তুলেছে মোহময়ী।

প্রায় এক ঘন্টা কাটানোর পর আমরা নেপাল বর্ডার পশুপতি হয়ে প্রবেশ করলাম লেপচাজগৎ-এ। করোনা পরিস্থিতির জন্য তখন পর্যটকদের নেপালে প্রবেশ নিষেধ ছিল। লেপচাজগৎ-এর একটি অন্যতম সুন্দর স্পট হলো জোড়পোখরি। নেপালি ভাষায় পোখরি কথার অর্থ জলাশয়, অর্থাৎ জোড়পোখরি কথার অর্থ হল দুটি জলাশয়ের সমন্বয়। পাহাড়ের কোলে অবস্থিত এই সুন্দর জায়গা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার খুব ভালো ভিউ পাওয়া যায়। জলাশয়ে বিচরণকারী রাজহাঁসের দল যেন এখানকার সৌন্দর্যকে করে তুলছে দ্বিগুণ। এখানে কিছু সরকারি বাংলোও আছে, চাইলে এখানে স্টে করা যেতে পারে।

অবশেষে আমরা রোডোডেনড্রন ও পাইন ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে এসে পৌঁছালাম আমাদের প্রি বুক করা Green Valley Homestey তে। বেলা গড়িয়ে দুপুর তখন, তাই চটপট দুপুরের খাবার খেয়ে একটু রেস্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গ্রামের চারপাশটা ঘুরে দেখার জন্য। গোধূলি নামতে আর বেশি দেরি নেই, ঠান্ডাটাও ক্রমশ বাড়ছে। আমাদের হোমস্টে থেকে সূর্যাস্তটাও খুব ভালো দেখা যায়। লোকাল মানুষদের কাছ থেকে জানতে পারলাম, এই ফরেস্ট নাকি ব্ল্যাক লেপার্ডদের বাসস্থান। রাতের অন্ধকারে সব যখন নিশ্চুপ তখনই লেপার্ডরা তাদের দলকে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়।

যাইহোক, রাতের ডিনার করে আমরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। পরের দিন ভোর বেলায় উঠে সোজা চলে গেলাম ভিউ পয়েন্ট-এ। তখন ভোর ৪ঃ৩০, ঘুটঘুটে অন্ধকার জঙ্গল, মাথায় ঘুরছে লেপার্ড-এর ভয়, আবার এদিকে সূর্যোদয় দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সবমিলিয়ে এক বিশাল অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলাম আমরা। রাতের অন্ধকারে ভিউ পয়েন্ট থেকে দেখা জোনাকির আলোর মতো দার্জিলিঙ শহর ঝিকমিক করছে, সে যেন এক অপূর্ব দৃশ্য। হাড় হিম করা ঠান্ডায় পাহাড়ের বুক চিরে সূর্যোদয়ে যেন ঘুমন্ত বুদ্ধদেবের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। ভোরের লাল আলোর ছটা যেন কাঞ্চনজঙ্ঘাকে রাঙিয়ে তুলেছে। সত্যি সে এক অসাধারণ দৃশ্য যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

সূর্যোদয় দেখে এসে ব্রেকফাস্ট করে নিলাম। এবার এখান থেকে বিদায় এর পালা। কিন্তু, এই মায়াবী প্রকৃতির মায়া যেন আমাদের ছাড়তেই চাইছিল না।

আপনারা চাইলে এখান থেকে দার্জিলিং, তাকদা, লামাহাটাও ঘুরতে পারেন।

*** চটকপুর.....**

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭৮৮৭ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত পাহাড়ে ঘেরা একটি ছোট্ট গ্রাম হলো চটকপুর। হাতে দিন দুয়েক সময় থাকলে, অল্প খরচেই চলে আসা যায় দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত এই ছোট্ট গ্রাম চটকপুরে। পাহাড়কে খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করার আদর্শ স্থান হলো এই চটকপুর।

তৃতীয় দিন ঃ তারিখ ২২/১২/২০২০

মেঘের শহর লেপচাজগৎ-এ একটি সুন্দর দিন কাটানোর পর আজকে আমাদের গন্তব্য চটকপুর।

সকালে ভিউ পয়েন্ট থেকে সানরাইজ দেখে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়লাম চটকপুরের উদ্দেশ্যে। আমাদের হাতে বেশ কিছু সময় থাকায় আমরা ভাবলাম ভারতের অন্যতম বিখ্যাত স্থান বাতাসিয়া লুপ ও ঘুম রেলওয়ে স্টেশন (উচ্চতা ৭৪০৭ ফুট) টা ঘুরে দেখব। তাই লেপচা জগৎ থেকে একটি শেয়ার গাড়ি করে সোজা এসে পৌঁছলাম বাতাসিয়া লুপ-এ। জনপ্রতি ভাড়া পড়লো মাত্র ৫০/- টাকা। বাতাসিয়া লুপ; এই স্থানে টয়ট্রেনের লাইনটি ৩৬০ ডিগ্রি রাউন্ড নিয়েছে। করোনা পরিস্থিতির জন্য এখন ট্রয়ট্রেন বন্ধ, যা আমাদের একটু হতাশ করেছিল। তবে আকাশ পরিষ্কার থাকায় এখান থেকে আমরা খুব ভালো কাঞ্জনজঙ্ঘার ভিউ পেয়েছি যা আমাদের টয়ট্রেন না চড়ার হতাশা পূরণ করে দিয়েছিল।

প্রায় ঘন্টা দেড় এক কাটানোর পর একটু পায়ে হেঁটে পৌঁছে গেলাম ঘুম স্টেশন-এ। UNESCO World heritage Site, Darjeeling Himalayan Railway-এর একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য স্থান হলো Ghum Railway স্টেশন। কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর এখান থেকে একটা গাড়ি বুক করে আমরা সোনাদা [Sonada] হয়ে রাস্তা ধরলাম চটকপুর-এর উদ্দেশ্যে। ভাড়া পড়লো জনপ্রতি ২০০/- টাকা করে।

মেইন রাস্তা থেকে একটু ওপরে উঠতেই চারিদিকে মেঘের হাতছানি। দেবদারু ও পাইন-এ মোড়া বন্য জীবজন্তুর আবাসস্থল হলো Senchal wild life Santuary এবং তারই মধ্যে মাত্র ১৯টা পরিবার ও ১০০ জনেরও কম মানুষকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এই সুন্দর গ্রাম চটকপুর। ফরেস্ট গার্ড-এর থেকে জানতে পারলাম এই অভয়ারণ্যে ভাল্লুক ও কালো চিতা সহ আছে বিভিন্ন জীবজন্তুর বসবাস। ফলে রাতের বেলায় ঘর থেকে বেরোনো পুরোপুরি বারণ। যাইহোক, প্রায় এক ঘন্টা সফর করার পর, আমরা এসে পৌঁছালাম আমাদের প্রি বুক করা Pooja valley Homestary তে। আমাদের এই হোম স্টে থেকে চারপাশের ভিউ দুর্দান্ত। মনে হচ্ছিল, কয়েক হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবো বরফে মোড়া কাঞ্জনজঙ্ঘা। বেলা গড়িয়ে দুপুর, খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড, তাই দেরি না করে চটপট লাঞ্চ সেরে একটু রেস্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গ্রামের চারপাশটা ঘুরে দেখার জন্য। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই চটকপুর সত্যি অতুলনীয় ও অবর্ণনীয়। গ্রামের মানুষরা খুবই মিশুকে ও ভালো।

বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে, তাপমাত্রাও ক্রমশ কমছে (৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস)। তাই জড়োসড়ো হয়ে ঢুকে পড়লাম লেপের তলায়। সন্ধ্যার স্ন্যাকস ও কফি এবং রাতের কষা মাংস আর রুটির সহযোগে বেশ ভালোই কাটলো রাতটা। পরের দিন সকাল বেলায় উঠে চলে গেলাম এখানকার নামকরা ভিউ পয়েন্ট-এ। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কাঠের সাঁকোর তৈরি আঁকাবাঁকা পথ, সত্যি সে এক অপূর্ব দৃশ্য। প্রায় ঘন্টা খানেক সময় কাটানোর পর আমরা ব্রেকফাস্ট করে এবার এগিয়ে চললাম জঙ্গালের ভিতরে অবস্থিত একটি ছোট্ট পবিত্র জলাশয় দেখার জন্য। ঘন দেবদারু বনের মধ্যে দিয়ে গুটি গুটি পায়ে হেঁটে এসে পৌঁছালাম সেই জলাশয়ে। বর্ষাকালে নাকি এই জলাশয়-এ প্রচুর সালাম্যানডার থাকে। তার ওপর ভাল্লুক ও বাঘের ভয়, তাই বেশি দেরি না করে সেখানে থেকে বেরিয়ে এলাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে যে কখন সময় কেটে গেলো বুঝতেই পারলাম না।

যাইহোক, এবার এখান থেকে আমাদের বিদায়ের বেলা। কিন্তু পাহাড়ের এই সৌন্দর্যকে বিদায় জানিয়ে বাড়ি যেতে সত্যিই একটু কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু মনে মনে এই বাসনায় করলাম যে, **আবার আসিব ফিরে।**

চটকপুর দিয়েই আমরা আমাদের ৩ রাত্রি ৪ দিন পর ট্রিপ শেষ করলাম। রাত ৯টার শিয়ালদহগামী পদাতিক এক্সপ্রেস ধরে সকাল সকাল এসে পৌঁছালাম আমাদের নিজবাসে।

আপনারা চাইলে চটকপুর থেকে কারসিয়াং, সিটং, আহলদারাও ঘুরে দেখতে পারেন।

সর্বোপরি এটাই বলবো যে, আমরা ওই কোভিড পরিস্থিতিতে সবাই ভালো ভাবে ও সুস্থ ভাবে ঘুরে ফিরে এসেছি, যা আমাদের জীবনের এক অন্যতম আনন্দের ও ভালোলাগার স্মরণীয় দিন হিসাবে চিরকাল মনে থাকবে।

ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ সবাইকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে — সে-ই ধন্য হয়ে যাবে।

— শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

গঙ্গোত্রীর পথে

রাহুল দাস (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

২০১৭ সাল। প্রতি বছরের মত সে বছরও পুজোয় ভ্রমণের পরিকল্পনা শুরু হল জুন-জুলাই থেকেই। সৌভাগ্য বশতঃ দিল্লী নিবাসী এক আত্মীয়র কাছ থেকে নিমন্ত্রণও পেয়ে গেলাম। স্কুল ছুটি পড়তেই আমরা লটবহর নিয়ে Ready দিল্লী চলো। দিল্লীতে দিন কয়েক কাটিয়ে তার পার্শ্ববর্তী দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নিলাম।

আমার আত্মীয় উচ্চপদস্থ সেনা অফিসার। উত্তরাখণ্ডের মাহিডান্ডা নামক এক পাহাড়ী সেনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত DIG। তাই ঠিক হলো সেখানেও কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসব। রওনা দিলাম মাহিডান্ডার উদ্দেশ্য। সড়ক পথে দিল্লী থেকে প্রথমে হরিদ্বার, হৃষিকেশ। সেখান থেকে প্রায় ১২ ঘণ্টার পথ মাহিডাণ্ডা। পথে পড়ল দেরাদুন, মুসৌরি, উত্তরকাশী। অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক শোভায় পরিপূর্ণ হিমালয়।

মাহিডাণ্ডা পৌঁছতেই আমাদের অনেকটা রাত্রি হয়ে গেল। পথশ্রমে ক্লান্ত সকলেই। সকাল হল, পাহাড়ী রোদ গায়ে মেখে, জানলাম এখান থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে গঙ্গোত্রী। গঙ্গার উৎস। মনে পড়ল "নদী তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? মহাদেবের জটা হইতে।"

সেই উৎসমুখের উদ্দেশ্যে চলেছি আমরা। গাড়িতে আমি ও আমার তিনজন সঙ্গী ছাড়াও রয়েছেন দুজন সশস্ত্র জওয়ান। আমাদের নিরাপত্তার স্বার্থে। নিজেকে বেশ heavy weight বলে মনে হচ্ছিল।

আমরা চলেছি। পথের একপাশে সুবিশাল হিমালয় পর্বত, অন্যপাশে বয়ে চলেছে পুণ্যতোয়া গঙ্গা। পাহাড়ী পথ চলতে চলতে প্রায়শই নদীকে পাশে রেখে চলতে হয়। চলেছিও আগে অনেকবার। কখনোও তিস্তার সাথে, কখনোওবা অলকানন্দার সাথে। কিন্তু গঙ্গাকে পাশে রেখে চলার অনুভূতিই আলাদা। বেলা বাড়ার সাথে সাথে হিমালয়ও তার রূপ পরিবর্তন করে চলেছে। কোথাও সবুজ চাদরে মোড়া, কোথাও কঠিন পাথুরে রূপ। পথে একস্থানে পড়ল উষ্ণ প্রস্রবণ। পাহাড়ী পথে এমন উষ্ণ প্রস্রবণ বিরল নয়। আগের দিনের সাধু-সন্ন্যাসীরা পদব্রজে তীর্থদর্শন করতে বেরোতেন। এই উষ্ণ প্রস্রবণে অবগাহন করে তাঁরা পথশ্রমের ক্লান্তি কাটাতেন। গাড়ী থেকে নেমে, গরম চা-য়ে চুমুক দিয়ে আমরাও ইতি উতি একটু ঘুরে দেখলাম। গাড়ী চলতে শুরু করল আবার। বিভিন্ন স্থানে গঙ্গার বিভিন্ন রূপ। কোথাও চঞ্চল, কোথাও শীর্ণ, কোথাও আবার ফল্গু ধারায় বহমান। যেতে যেতে এক সময় চোখে পড়ল হিমালয়ের বরফাবৃত শৃঙ্গ। তবে কি এটাই মহাদেবের জটা? হিমালয়ই কি সেই দেবলোক? কয়েক মুহূর্তের জন্য বোধহয় হারিয়ে গেছিলাম। আমরা প্রায় এসে পড়েছি গঙ্গোত্রী মন্দিরের কাছে। Parking Zone থেকে বেশ খানিকটা পথ হেঁটে যেতে হল। দুপাশে পুজার সামগ্রী সাজির দোকান রয়েছে। মন্দির চত্বর পেরিয়ে কয়েকটা সিঁড়ি নেমে গিয়ে দেখলাম সফেন, উজ্বল জলরাশি প্রবল বেগে আছড়ে পড়ছে উপলরাশির উপর। সদ্যজাত গঙ্গা। অর্বণনীয় সেই রূপ শুধু উপলব্ধিই

করা যায় মাত্র। আমরা সমতলের মানুষরা গঙ্গার এক প্রকাণ্ড রূপের সাথে পরিচিত। উৎসমুখে তার এই রূপ সত্যিই অবিশ্বাস্য। গঙ্গোত্রী থেকে বঙ্গোপসাগর দীর্ঘ এই যাত্রাপথে কত না জলধারা উপনদী সমৃদ্ধ করেছে তাকে। নিরাপত্তা রক্ষার্থে ঘাটের সিঁড়ি গুলির শেষে ধাপে রেলিং করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানেও সেই এক চিত্র। ধর্মভীরু ভারতবাসী। বিপদ উপেক্ষা করে, পুণ্য সঞ্চয়ের লোভে হিমশীতল জলে অবগাহন করে পাপক্ষালন করছে। তাই বোধ হয় বলে "পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে।"

সুবিশাল মন্দির চত্বর। মা গঙ্গার মুর্তিতে নিত্যপুজার ব্যবস্থা। স্থানীয় মানুষ ও পর্যটকেরা ভক্তিভরে পূজা দিচ্ছেন। আমিও দিলাম। আমার মধ্যেও যে সেই ধর্মীয় সত্তা বর্তমান। এবার মাহিডাঙা ফেরার পালা। গাড়ি Start করল। কিছুদূর নামার পর, গাড়ি থামল চমেলী তে। বিশাল এক ঝর্ণার পাশে। Driver বললেন এখানে অনেক হিন্দী সিনেমার শুটিং হয়ে থাকে। আমরাও ফটোশুটের লোভ সামলাতে পারলাম না। মাহিডাঙা ফিরতে রাত্রি হল।

পরের দিন হরিদ্বার থেকে ট্রেন। ঘরে ফিরতে হবে। পাহাড়ে আমার চোখে পড়েছিল, স্থানে স্থানে সাইনবোর্ড লেখা "Wellcome to Debbhum", সত্যিই দেবভূমিই বটে। মনটা খারাপ করছিল। কোথাও যেন একটা বিচ্ছেদ এর সুর বাজছিল। তবে কি পাহাড়টাকে ভালোবেসে ফেললাম! বিদায় বেলাটা সত্যিই করুণ।

অবকাশ

বিশাল বিশ্বাস (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

আমার বেলা যায় ব্যস্ততায়,
কখনো এ কাজ কখনো সে কাজের বাহানায়।
তাই হয়তো ভাবার অবকাশ পাইনা,
হয়ত সেসব আর ভাবতে চাইনা।
সন্ধ্যে বেলা বহুতল বাসার ব্যালকনিতে,
আরাম-কেদারায় বসে ফুঁ দিই চায়ের কাপেতে।
শহরের নিয়ন আলোয় কিছু মনে পড়ে যায়,
কি করে দুজন পথিকের পথ মিলে যায়!
চলতে চলতে কিছু গল্পও হয়,
দেখতে দেখতে অমনি পথ আলাদা হয়ে যায়।
এখন একলা পথিক একলাই হাঁটছে,
একলাই হাসছে, একলাই কাঁদছে।
আজকার আবেগ কাজ করে না,
অনুভব করার মতো অনুভূতি আর হয়না।
শুনছি আজকাল মুখোশ পরার চল,
যে পরেনি সেই নাকি দুর্বল।
তাই হয়ত এ পথিকের পথ একা হয়ে গেছে,
প্রজাতি থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে।
সীমাহীন যাত্রা চলেছে অহোরাত্র,
জীবন অদ্ভুত, জীবন বিচিত্র,
ভাবতে ভাবতে রাত হলো,
ফুঁ দিতে দিতে চা কাপেই রয়ে গেল।

ডুয়ার্স ভ্রমণ

দীপঙ্কর বর্মন (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

সালটা ছিল ২০১৩। আমার পূর্বতন কলেজে ডিপার্টমেন্টের সবার নজর ছিল একটি বিষয়ের উপরই। কারণ কদিন আগেই জানানো হয়েছিল ডিপার্টমেন্ট থেকে ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হবে। ভ্রমণ ক্ষেত্রটি ঠিক করার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ছিল ছাত্রদের উপর। আগেই দূরে কোথাও ভ্রমণ করেছে তাদের সংখ্যাটা খুবই কম ছিল ডিপার্টমেন্টে। ছাত্রদের বেশিরভাগের কাছেই ছিল এটাই প্রথম ভ্রমণ; যেখানে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দূরে কোথায় গিয়ে সেই পরিবেশটাকে সবাই একসঙ্গে থেকে উপভোগ করবো। সবার মনে ভীষণ উত্তেজনা, ৩০ জন সহপাঠীর মুখে ৩০টা জায়গার নাম। কেউ বলেছে দেরাদুন যাবে, কেউ যাবে মেঘালয় আবার কেউ যেতে চায় কাশ্মীর অর্থাৎ যেন একজনের পছন্দের সঙ্গে অপরজনের পছন্দের মিল নেই আর মিল থাকলেও বা তাতে কি, কারণ কাশ্মীর, দেরাদুন বা মেঘালয়ে যাওয়ার মতো টাকাকড়ি আমাদের অনেকের হাতে ছিল না। শেষে উৎপল স্যার সবার কথা মাথায় রেখে ডুয়ার্স অঞ্চলকে ভ্রমণের ক্ষেত্র হিসাবে ঠিক করলেন। যদিও সহপাঠী স্বপ্ননীল ও দীপায়ন প্রথমের দিকে এতে রাজি ছিল না; যেহেতু তারা চেয়েছিল দেরাদুন, কাশ্মীরের মতো জায়গায় ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হোক। অবশেষে স্যার তাদের ডুয়ার্সের অপূর্ব সৌন্দর্যের বর্ণনা দিলে তারা মেনে নেয়।

প্রথম দিন ঃ—

ডিসেম্বরের ২০ তারিখ ভ্রমণের দিন হিসাবে ঠিক করা হয়। কথা ছিল ওইদিন সকাল ৭টার মধ্যে কলেজ ক্যাম্পাসে এসে উপস্থিত হতে হবে, সেই অনুযায়ী সবাই এসে উপস্থিত হই। স্বপ্ননীল ও দীপায়ন সবার শেষে এসে পৌঁছায়। সকাল ৭ঃ৩০-এ রিজার্ভ বাসে উঠে আলিপুরদুয়ার শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দিই কলেজ ক্যাম্পাস থেকে। আলিপুরদুয়ারে ট্রাভেল এজেন্সির লোকেরা আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিলো। দুপুর ২টায় আলিপুরদুয়ার শহরে এসে পৌঁছায়। ট্রাভেল এজেন্সির গাড়িতে ওঠার আগে এক হোটেলে সবাই রুটি-তরকারি খেয়ে নিই যেহেতু সকালে সামান্য জলখাবার খেয়ে বেরিয়েছিলাম। এরপর ট্রাভেল এজেন্সির রিজার্ভ করা গাড়িতে ওঠে জয়ন্তীর উদ্দেশ্যে রওনা দিই। দেড় ঘন্টার পর জয়ন্তীর রির্সোটে পৌঁছাই, সেখানে ফ্রেস হয়ে আরাম করার পর সুস্বাদু খাবার খেয়ে বাকি দিনটুকু আশেপাশে মনোরম পরিবেশকে উপভোগ করে কাটিয়ে দিই। রাত্রিযাপন জয়ন্তীতেই করি।

দ্বিতীয় দিন ঃ—

পরের দিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে পড়ি জয়ন্তীর স্থানাদি দর্শন করতে। দ্বিতীয় দিন আমাদের জয়ন্তী পরিদর্শন শুরু হয় বক্সা ফোর্ট দশমের মধ্যে দিয়ে। বক্সা ফোর্টের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে, ঔপনিবেশিক সময়ে এই ফোর্টটিতে নাকি অপরাধীদের বন্দি করে রাখা হত। এছাড়াও এখানে রয়েছে পোকারি হিল; যার শীর্ষস্থান থেকে "বক্সা টাইগার রিজার্ভের" সৌন্দর্য সুন্দরভাবে উপভোগ করা যায়। দিনটি

এইভাবেই জয়ন্তীর সুন্দর মনোরম পরিবেশ পরিদর্শন করতে করতে কখন শেষ হয়ে আসবে তা বুঝে উঠতে পারবেন না।

তৃতীয় দিন ঃ—

জয়ন্তীতে রাত কাটিয়ে পরের দিন সকালে রওনা দিই জলদাপাড়া জঙ্গল সাফারির উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছে ফ্রেস হয়ে খাওয়া-দাওয়ার পর বেরিয়ে পড়ি জঙ্গল সাফারিতে। জলদাপাড়া জঙ্গালের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে তোর্ষা নদী। এই জঙ্গালের প্রধান আকর্ষণীয় পশুটি ছিল এক সিংওলা গন্ডার। এছাড়াও সবুজ গাছপালায় ভরা এই জঙ্গালটিতে হাতি, লেপার্ড, হরিণ ও বিভিন্ন প্রজাতির পাখি দেখেছিলাম। জঙ্গাল সাফারির পর রির্সোটে ফিরে আসি এবং রাত্রি সেই জলদাপাড়ার রিসোর্টে কাটিয়ে দিই।

চতুর্থ দিন ঃ—

জলদাপাড়ায় রাত কাটিয়ে পরের দিন রওনা দিই গরুমারা জঙ্গাল সাফারির উদ্দেশ্যে লাটাগুড়িতে। জলদাপাড়া থেকে লাটাগুড়ি ২ ঘন্টা জার্নির পর লাটাগুড়িতে রির্সোটে উঠি। সেখানে ফ্রেস হয়ে খাওয়া-দাওয়ার পর গরুমারা জঙ্গাল সাফারিতে বেরোই। বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা ও প্রাণীতে ভরা গরুমারা জঙ্গালের মনোরোম মনোমুগ্ধকর পরিবেশ উপভোগ করার পর রির্সোটে ফিরে আসি এবং রাত্রিযাপন লাটাগুড়িতে করি।

পঞ্চম দিন ও ষষ্ঠ দিন ঃ—

পরেরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্রেক ফাস্টের পর সবুজে ঘেরা ছোট গ্রামগুলি যেমন, ঝালং, বিন্দু, রকি, আইসল্যাণ্ড পরিদর্শনে বেরোয়। ক্ষুদ্র গ্রাম ঝালং, ঝালং নদীর তীরে অবস্থিত। এখানকার প্রধান আকর্ষণ হল জলচাক্কা হাইড্রো প্রজেক্ট। পশ্চিমবঙ্গের শেষ গ্রাম "বিন্দু" থেকে পাহাড় ও উপত্যকা গুলিকে খুব সুন্দর ভাবে দূর থেকে উপভোগ করা যায়। সবুজে ভরা ঘন জঙ্গাল মৃত্তিকাকে ঢেকে রেখেছে। এখানকার রকি আইসল্যাণ্ড তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য দারুণভাবে পরিচিত। এইভাবে লাটাগুড়ির রির্সোটে এখানকার সুন্দর পরিবেশকে উপভোগ করে তিন দিন কাটিয়ে দিই।

সপ্তম দিন ঃ—

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে এবার বাড়ি ফেরার পালা। নিজের নিজের সবকিছু ভালো করে চেক করে ব্যাগে ঢুকিয়ে প্রস্তুত রাখা। এরপর সকালের ব্রেকফার্স্ট করে রিজার্ভ বাসে উঠে লাটাগুড়ি থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা।

এইভাবেই মনোমুগ্ধকর ডুর্য়াসকে বিদায় জানিয়ে আমাদের ডুর্য়াস ভ্রমণ সম্পূর্ণ করি। তৈরি হয় অসংখ্য স্মৃতি। শেষে কলেজে ফিরে স্বপ্ননীল ও দীপায়ন বলে উঠল "ডুর্য়াস সত্যি অসাধারণ সৌন্দর্যময়। উৎপল স্যার যা বলে বর্ণনা দিয়েছিলেন তার থেকেও অনেক সুন্দর। আমরা দেরাদুন, কাশ্মীরে গেলে যা ডুর্য়াসে উপভোগ করেছি তা কখনোই করতে পারতাম না, আমাদের এই ডুর্য়াস ভ্রমণ জীবনের এক অন্যতম স্মৃতি হয়ে থাকবে।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ ২০২৩ 'বকখালি'

সুব্রত জেলে (ছাত্র, বি.এড. ২০২২-২৪)

"আমার মন বসে না শহরে
ইঁট পাথরের নগরে
তাই তো আইলাম সাগরে...."

সাগরের আকর্ষণ প্রতি মানুষ প্রাণে প্রাণে অনুভব করে। একঘেয়েমি ভরা প্রতিদিনের জীবনে আনন্দের সিঞ্চন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। তারি সাথে পড়া-বিদ্যার পাশাপশি জীবন কেন্দ্রিক অপড়া-বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য আমাদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটি শিক্ষণীয় ভ্রমণের আয়োজন করে। এই ভ্রমণ আয়োজনের মূল দায়িত্বে ছিলেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রী সঞ্জয় মিত্র (সঞ্জয় স্যার)। আমাদের ভ্রমণ ক্ষেত্র হিসাবে প্রথমে ঠিক হয় মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি ঐতিহাসিক স্থান, কিন্তু পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির চাপে তার পরিবর্তে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বকখালি ভ্রমণ ঠিক করা হয়। অধ্যক্ষ মহারাজের অনুমতি নিয়ে আমরা যাওয়ার চূড়ান্ত দিনক্ষণ ঠিক করলাম। আমাদের মনে ব্যাকুলতা ও আগ্রহ দুই-ই বাড়তে থাকলো।

আমাদের প্রিয় অধ্যাপক কৌশিক চট্টোপাধ্যায় পূর্ববর্তী ভ্রমণের অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরে এই আগ্রহ আরো বাড়িয়ে তুললেন। আমাদের মনে তখন নানা কল্পনার প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হতে শুরু করেছে। হোস্টেলে এক আনন্দের জোয়ার বয়ে চলেছিল সকলের চোখে মুখে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক হয় ২০শে জুলাই সকাল ৯ঃ১৬ শিয়ালদহ থেকে নামখানা লোকাল ধরে রওনা হব। আমরা হোস্টেল থেকে সকাল ৭ঃ৪৫-এর ব্যারাকপুর লোকাল ধরে শিয়ালদহ পৌঁছাব সাথে কৌশিক স্যার ও স্বর্ভাণু স্যার।

অনাবিল আনন্দ নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরুর তোড়জোড় শুরু হল প্রায় ভোর পাঁচটা থেকে। অন্যদিন এই সময় হোস্টেলে নীরবতা বিরাজ করে, কিন্তু আজ সেই নীরবতার পরিবর্তে চরম ব্যস্ততা চারিদিকে, হাঁকডাকে মুখরিত হয়ে উঠেছে সারদানন্দ ধাম। ভ্রমণের আনন্দের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠছে তন্দ্রাচ্ছন্ন মুখগুলি মধ্যে। আমরা হোস্টেল থেকে অত সকালে অল্প করে ভাত খেয়ে, ঠাকুরের কাছে শুভ কামনা জানিয়ে সকাল ৭টা ব্যারাকপুর লোকালে শিয়ালদা উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। কথা ছিল সকলে শিয়ালদহ এসে মিলিত হবে। শিয়ালদায় পৌঁছে দেখি সঞ্জয় স্যার আমাদের পৌঁছানোর আগেই শিয়ালদায় পৌঁছে গিয়েছেন। একে একে সকলে উপস্থিত হলাম। এইবারে ভ্রমণে অংশগ্রহণ করেছিল ছাত্রদের মধ্য থেকে ৪১ জন এবং ৫ জন শিক্ষক। সঞ্জয় স্যার সমগ্র পরিকল্পনার দায়িত্বে ছিলেন। সাথে ছিলেন কৌশিক স্যার, তুষার স্যার, প্রসেনজিৎ স্যার ও আমাদের হোস্টেলের সংগীতের শিক্ষক স্বর্ভাণু স্যার। একসাথে ভ্রমণের যে অফুরন্ত আনন্দ তা প্রতিক্ষণে অনুভব করতে করতে রেলের টাইম টেবিলে ভেসে উঠল ৯ঃ১৬-র নামনাখা লোকালের নাম। আমরা ব্যাগপত্র কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে

উঠে বসলাম ট্রেনে। একই কম্পার্টমেন্টে আমরা ৪০ জন উঠে বসলাম। তুষার স্যার যাদবপুর থেকে আমাদের সাথে যোগ দেবেন ও আমাদের আরো কয়েকজন সতীর্থ সোনারপুর, বারুইপুর থেকে উঠবে।

ঠিক ৯ঃ১৭ ট্রেনের চাকা গড়ালো। আমরা এসাথে গান, গল্প, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে ১২ঃ৩০ নাগাদ পৌঁছে গেলাম নামখানা স্টেশনে। ট্রেন থেকে নামার পর কৌশিক স্যার ও প্রসেনজিৎ স্যার এই সমগ্র ভ্রমণ সম্পর্কে কিছু উপদেশ দিলেন। এই নির্দেশগুলি শুনতে শুনতে আমার বৈদিক শ্লোকের একটি মন্ত্র মনে পড়ে গেল "সং গচ্ছধ্বং স বদধ্বং সং বো মনাং..." অর্থাৎ এক সাথে চলব, এক কথা বলব। এই অল্প যাত্রার মধ্যেই ছাত্র-শিক্ষক আমরা সকলেই যেন এক হয়ে গেছি। নামখানা স্টেশনের বাইরে এই বৃহৎ পরিবারের একটি গ্রুপ ফটো তোলা হলো। এক পরিবার হয়ে আমরা বকখালির দিকে রওনা হলাম অটোয় করে। প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম বকখালির ত্রিভা লজে যেখানে আমাদের রাত্রি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

হোটেলের রুমে আমাদের জিনিসপত্রগুলি রেখে ফ্রেশ হয়ে মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য রওনা হলাম। বকখলির নামকরা বনশ্রী হোটেলে। দুপুরের মেনুতে ছিল আলুভাজা, ভাত, ডাল, শুক্তো, রুই মছের কালিয়া, চাটনি, পাপড় সাথে স্যালাড, লেবু, কাঁচা লঙ্কা। খাওয়ার পর হোটেলে গিয়ে পোশাক পরিবর্তন করে রওনা হলাম সমুদ্র সৈকতের দিকে। সঞ্জয় স্যারের নেতৃত্বে আমরা প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসের সাথে ফুটবল ও ভলিবল নিয়ে চললাম সমুদ্র সৈকতে। বকখালি সমুদ্র সৈকতের বৈশিষ্ট্য আকাশ আর সমুদ্র যেন এক হয়ে গেছে। যেহেতু আমার পুরী ও দিঘার সমুদ্র সৈকত ঘুরবার অভিজ্ঞতা আছে সেই থেকে বলছি বকখালির একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, যা এই সু-প্রসিদ্ধ পর্যটন ক্ষেত্র থেকে আলাদা। আমরা সকলেই প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসের সাথে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লাম, আমাদের সাথে সঞ্জয় স্যার, তুষার স্যার ও প্রসেনজিৎ স্যার যোগ দিলেন। কৌশিক স্যার ও স্বর্ভাণু স্যার বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আমাদের উৎসাহিত করছিলেন। সমুদ্র যেন আমাদের পেয়ে তার ঢেউয়ের মাত্রা বাড়িয়ে আনন্দের প্রকাশ ঘটাচ্ছে। আমরা প্রায় দু'ঘণ্টা সমুদ্রের জলে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর ৩০ মিনিট সমুদ্রের পাড়ে ফুটবল খেলা হলো, সঞ্জয় স্যারের টিম বনাম প্রসেনজিৎ সারের টিম যদিও গোল ০-০। এরপরও আমরা বিভিন্ন গ্রুপ ফটো তুললাম। কিছুক্ষণ যোগাসন অভ্যাস করলাম। কখন যে সন্ধ্যা ছটা বাজলো

বুঝতেই পারলাম না। মন না চাইতেও ডুব ফিরে এলাম। হোটেলে স্নান করে পোশাক পরিবর্তন করে পুনরায় সমুদ্র সৈকতে উপস্থিত হলাম।

বকখালির প্রধান সমুদ্র সৈকতে সন্ধ্যার সময় নানা রকম সামুদ্রিক মাছেদের পসরা সাজিয়ে বিভিন্ন দোকান বসেছে। সেখানে অক্টোপাস থেকে শুরু করে সামুদ্রিক ভেটকি, লোটে, সুন্দরবনের কাঁকড়া, চিংড়ি, ইলিশ, পমফ্রেট প্রভৃতি রকমারি টাটকা মাছ পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের প্রথম বর্ষের আকাশনীল খেলো অক্টোপাস, আমরা খেলাম সামুদ্রিক ভেটকি, সোমনাথ খেল সুন্দরবনের কাঁকড়া, বিকাশ খেল লোটে, আরো বন্ধুরা নানা রকম মাছ খেতে থাকলো। মাছ খাওয়া-দাওয়া চলছে, এমন সময় সমুদ্রের তীরে কৌশিক স্যারের অপূর্ব গানের আওয়াজ ভেসে এল, তাকিয়ে দেখি সকলে গোল করে দাঁড়িয়ে উল্লাসে গান গাইছে, সৌভিকের হাতে গিটার অনবদ্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমরাও তাড়াতাড়ি যোগ দিলাম গানের আসরে। আমরা সকলে হাততালি দিতে দিতে গলা মেলাবার চেষ্টা করলাম। কৌশিক স্যার ও স্বর্ভাণু স্যারের অপূর্ব গানে পরিবেশটা দুর্দান্ত জমে উঠেছিল। সাথে সমুদ্রের মৃদুমন্দ গর্জন শীতল প্রাণবন্ত বাতাস ও মাঝে মাঝে এক পসলা বৃষ্টি স্বর্গীয় অনুভূতি সৃষ্টি করল। আমরা কয়েকজন থাকতে না পেরে গানের সাথে নৃত্যে পা মেলালাম। কখন যে ঘড়ির কাঁটায় রাত্রি নটা বেজে গেছে বুঝতেই পারলাম না। সঞ্জয় স্যার আমাদের নৈশ ভেজের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, আমরা গানের লাইনগুলি গুনগুন করতে করতে বনশ্রীর দিকে রওনা হলাম। রাত্রে আমাদের জন্য স্পেশাল চিকেন বানানো হয়েছিল, একসাথে সুন্দর ভাবে খাওয়া-দাওয়া করে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। হোটেলে ফিরেও আমাদের মনে ক্লান্তি নেই অফুরন্ত আনন্দের জোয়ার বইছে। গল্পগুজব, স্যারদের গলা মিমিক্রি করা বিশেষত কৌশিক স্যারের গলা নকল করা চলতে থাকলো গোটা হোটেল জুড়ে। রাত্রে আরো একবার গানের আসর বসলো, স্বর্ভাণু স্যার ও সৌভিকের গলায় অপূর্ব কিছু গান শোনা হলো। সঞ্জয় স্যার একটু পরে যোগ দিলেন আমাদের আসরে। সেখানে মান্না দে থেকে শুরু করে কিশোর কুমার, রবীন্দ্র সংগীত, আধুনিক গান চলতে থাকলো প্রায় সাড়ে বারোটা পর্যন্ত। রাত্রে কি ঘুমোবার জো আছে। হোটেলের রুমে রুমে আরশোলা আর বড়ো বড়ো ইঁদুরের নৃত্য আমাদের আনন্দকে ছাপিয়ে গিয়েছে। আমাদের উচ্ছ্বাস তাই নিয়েও।

পরের দিন সকাল সকাল উঠে আমরা বেশ কয়েকজন বন্ধু মিলে চলে গেলাম সমুদ্রের পাড়ে। অপূর্ব সামুদ্রিক সৌন্দর্য় দেখে মোহিত হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ ছবি তুললাম। এরই মধ্যে সঞ্জয় স্যারের কল, কারণ সকাল ছটায় আমাদের বকখালির সাইট সিন পরিদর্শন করবার কথা। সেইমতো সকলে প্রস্তুত। আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। একসাথে দশটা টোটোয় করে বেরিয়ে পড়লাম মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে। মেঠো রাস্তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল আমাদের টোটোর সারি। আমাদের প্রথম গন্তব্য হেনরীজ আইল্যাণ্ড। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাছ চাষের ভেড়ির মনোরম পরিবেশের মধ্য দিয়ে পৌঁছে গেলাম আমাদের গন্তব্যে। হেনরীজ আইল্যাণ্ড। সেখানে গিয়ে ম্যানগ্রোভের বনের অপূর্ব সৌন্দর্যের সাথে লাল কাঁকড়ার পাল দেখতে দেখতে একটি বাঁশের সেতুর মধ্য দিয়ে সমুদ্র সৈকতের দিকে এগিয়ে গেলাম। সৈকতের শীতল বাতাস আমাদের রোমাঞ্চিত করল। এই আইল্যাণ্ডের সমুদ্রের ঢেউ বেশ বেশি। এখানে আমরা সমবেতভাবে বেশ কয়েকটা গ্রুপ ফটো তুললাম। ঝিনুক কুড়িয়ে নিলাম প্রচুর। সকালের সূর্যটাকে সমুদ্রের কোলে রাজার মতো লাগছিল।

ব্রিটিশ রাজকর্মচারী জন হেনরীজ এই আইল্যাণ্ডটি আবিষ্কার করেন বলে তার নাম অনুসারে এই আইল্যাণ্ডের নাম রাখা হয় হেনরীজ অইল্যাণ্ড। এই মনোরম পরিবেশ দর্শন করে আমরা টোটোর কাছে ফিরে এসে চা পান করলাম। তারপর রওনা হলাম আমদের দ্বিতীয় গন্তব্যের দিকে।

আমাদের দ্বিতীয় গন্তব্য ফ্রেজার গঞ্জের মৎস্য বন্দর। সেখানে গিয়ে পাঁচ টাকা করে টিকিট কেটে পৌঁছে গেলাম ভেতরে। বর্ষার রূপালি শস্য ইলিশ বোঝাই সারি সারি ট্রলার সমুদ্র থেকে বন্দরে নোঙর করছে। চোখের সামনে দেখতে পেলাম টন টন ইলিশ ট্রলার থেকে বার করা হচ্ছে। ইলিশ ও নানা ধরণের সামুদ্রিক মাছ ট্রলার থেকে বার করা হচ্ছে। আমার জীবনে এই প্রথম একসাথে এত পরিমান ইলিশ দেখা। এই বন্দরে একদিকে যেমন ট্রলার থেকে মাছ খালি করা হচ্ছে, অপরদিকে জাল মেরামত, পানীয় জল ও খাবার সামগ্রী ট্রলারে মজুত করা হচ্ছে পরবর্তী যাত্রার জন্য। এই বন্দরে আমাদের মাছ দেখেই মনে শান্তি পেতে হলো কারণ এখান থেকে আমরা ইলিশ কিনতে পারলাম না। যেহেতু ট্রলার গুলি যাত্রা শুরুর আগে দাদন নিয়েছে মহাজনের কাছ থেকে ফলে তারা মহাজন ছাড়া কাউকেই মাছ বিক্রি করতে পারবে না। যাইহোক এই বিপুল পরিমাণ ইলিশ চোখের সামনে দেখে আমরা পরবর্তী গন্তব্যের দিকে রওনা হলাম।

সমুদ্র সৈকতের পাড় দিয়ে ফ্রেজার গঞ্জের বায়ু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বড় বড় পাখাগুলি দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম নীলকুঠির কাছে। নীলকুঠির আগেই এখানকার প্রাচীন গঙ্গা মন্দির যেখানে জেলেরা মা গঙ্গার কাছে পুজো দিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ শিকারের জন্য রওনা হয়। মা গঙ্গাকে প্রণাম জানিয়ে আমরা সমুদ্র সৈকতে চলে গেলাম। এই নীলকুঠিতে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার মাঝে মাঝে থাকতেন।

তিনি বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এই স্থানটি আবিষ্কার করেন। তার এই প্রচেষ্টার কারণে এই অঞ্চলের নাম রাখা হয় ফ্রেজারগঞ্জ। আমরা এই নীলকুঠির সামনে একটি গ্রুপ ফটো তুলে বনশ্রীর দিকে রওনা হলাম সকালের জলযোগ সারতে। ঘড়ির কাঁটায় তখন প্রায় দশটা। গরম পরোটা ও ঘুগনি সহযোগে প্রাতঃরাশ সেরে রওনা হলাম হোটেলের দিকে। বনশ্রী থেকে ত্রিভা হোটেলের দূরত্ব হাঁটা পথে পাঁচ মিনিট। হোটেলে এসে স্নান সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে ভারাক্রান্ত মনে ব্যাগ গুছিয়ে দুপুর বারোটার সময় রওনা হলাম বনশ্রীর দিকে, কারণ দুপুরের মধ্যাহ্ন ভোজের পর একেবারে রওনা হবো কলকাতার উদ্দেশ্যে। আজ দুপুরে আমাদের জন্য ছিল টাটকা সরষে ইলিশ ভাপা। মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপির তরকারি, সর্ষে ইলিশ, চাটনি, পাপড়। প্রাণ ভরে ইলিশ খেয়ে বাসে করে বকখালিকে বিদায় জানিয়ে নামখানার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বাসে প্রসেনজিৎ স্যার কিছু গান চালালেন। আমরা গান শুনতে ও গাইতে গাইতে নামখানায় পৌঁছে গেলাম। বিকেল তিনটায় নামখানা — শিয়ালদহ লোকালে এক কম্পার্টমেন্টে সবাই উঠে বসলাম। তারপর হেমন্ত হাতে গিটার ধরল এবং সমবেতভাবে নানা রকমের গান গাইতে গাইতে তিন ঘণ্টার পথ যেন এক নিমেষেই পার করে ফেললাম। মধুময় স্মৃতি হয়ে রইল এই যাত্রাখানি।

এই সমগ্র ভ্রমণ থেকে আমরা জীবন কেন্দ্রিক কি কি জ্ঞানার্জন করলাম। সকলকে একসাথে নিয়ে চলা, সকলের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের মাধুর্য অনুভব করা, সু-শৃঙ্খল আনন্দের মধ্য প্রতিষ্ঠানের নাম অখুন্ন রাখার তাড়না। কঠিন পরিস্থিতির সমাধান এবং চরম আনন্দের মধ্যেও নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখবার প্রয়োজনীয়তা। সর্বোপরি সমবেত আনন্দের প্রয়োজনীয়তা আমরা সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছি। এমন ভ্রমণ-সুখ আমাদের জীবনে বার বার আসুক।

Swami Vivekananda on Education

Swami Nirishananda
[Principal (Actg.)]

Since times immemorial, education plays a pivotal role in human development. One needs education not only to earn some bookish theoretical knowledge but also to elevate himself to the higher self, to break the boundaries of human limitations and to explore the inner self. Swami Vivekananda, the great philosopher and the prophet of this era, has kept his valuable ideas on Education in front of us. This paper will help us to understand easily the idea of Education in brief according to Swami Vivekananda and encourage us to explore more about the precious educational ideas of Swami Vivekananda from the available primary sources.

Definition of Education :–

Swamiji has given the most relevant definitions of Education. They are –

i) Education is the manifestation of the perfection already in man.
ii) Education is the nervous association of certain ideas.
iii) The training by which the current and expression of will are brought under control and become fruitful is called education.
iv) Education is not filling the mind with a lot of facts. Perfecting the instrument and getting complete mastery of my own mind is the ideal of education.
v) Real education is that which enables one to stand on one's own legs.

The definition itself describes how mind, body and soul could be integrated through education and how one can enhance the will power through education. Swamiji's idea of education is not limited within the material development of a man but the spiritual development in its fullest, i.e., the manifestation of the Perfection / Divinity within man.

In his various writings, Swamiji describes in details - what type of education did he want? He says –

i) We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet.

ii) Education must provide 'life-building, man-making, character-making assimilation of ideas".

Swamiji very specifically describes that education must be used as a vehicle to form the character, strengthen the mind and the intellect. Moreover, he opines that education should help a person to build his character.

The Education System :–

Swamiji very vividly describes the education system to be followed, especially in India.

In the system of education, teacher is the prominent figure. Students should keep their close contact with their teachers to learn many new things from the personal lives of the teachers.

Swamiji quotes, "My idea of education is personal contact with the teacher – Gurugriha-Vâsa. Without the personal life of a teacher, there would be no education."

Teacher will be the role model in teaching-learning process and thus, vicarious learning will be promoted easily within the learners.

The Method of Teaching:

From "The Complete Works of Swami Vivekananda", we may guess the following methods have been supported while teaching in the field of Education by Swamiji. They are – Lecture Method, Demonstration method, Discovery method, Problem-solving method etc., but Swamiji preferred and suggested informal & non-formal way of teaching to spread **education** among the masses. Swamiji quotes – "Get every evening a crowd of the poor and low, and lecture to them about religion first, and then teach them through the magic-lantern (a camera, a globe, some maps) and other things, astronomy, geography etc."

He not only describes the method of teaching but also prescribes several methods of learning.

The Method of Learning :–

Constructivism : Swamiji not only promoted self-education or auto education – " A child teaches itself ", " no one can teach anybody " etc., but also he expressed the mystery of learning – " To me the very essence of education is concentration of mind, not the collecting of facts. If I had to do my education over again, and had any voice in the matter, I would not study facts at all. I would develop the power of concentration and detachment, and then with a perfect instrument I could collect facts at will ".

The Role of Teacher :–

According to Swamiji, the role of teacher is quoted below :

i) Teacher can take away the obstacles, but knowledge comes out of its own nature. Loosen the soil a little, so that it may come out easily. Put a hedge round it; see that it is not killed by anything, and there your work stops. You cannot do anything else. The rest is manifestation from within its own nature.

ii) The external teacher offers only the suggestion which rouses the internal teacher to work to understand things.

iii) Each human being stands for the divine, and, therefore, every teacher should be helpful, not by condemning man, but by helping him to call forth the divinity that is within him.

iv) The only true teacher is he who can convert himself, as it were, into a thousand persons at a moment's notice. The only true teacher is he who can immediately come down to the level of the student, and transfer his soul to the student's soul and see through the student's eyes and hear through his ears and understand through his mind. Such a teacher can really teach and none else.

Swamiji describes learning is the process which helps an individual to develop his inner-self or to arouse the divinity within a man.

The Role of Student/Learner/Disciple :–

According to Swamiji, a student must possess the following qualities within himself or herself. (i) Shraddha / Respect (ii) Discrimination (iii) Self- control (iv) Firm determination (v) Habits (vi) Renunciation & Service.

He has considered the above qualities as the key ingredients of our education system. Without these ingredients, proper learning will not be possible.

The Importance of Education :–

Although Swamiji did not have a deep faith in the present education system but he felt that the education system as it is going on, is yet to be in the society to civilize the common masses. The quotes of Swami Vivekananda related to this point are enumerated below.

i) All the wealth of the world cannot help one little Indian village if the people are not taught to help themselves. Our work should be mainly educational, both moral and intellectual.

ii) Educate and raise the masses, and thus alone a nation is possible.

iii) Education, education, education alone!

iv) Education is the panacea.

v) Through education comes faith in one's own Self.

vi) We have wept long enough. No more weeping, but stand on your feet and be men. It is man-making education all round that we want.

vii) The only way to bring about the levelling of caste is to appropriate the culture, the education which is the strength of the higher castes.

viii) Mass culture is to be raised.

Defects of current Education System :–

Swamiji not only has described how education system can be implemented in the present society, but also explores the faults in it. He quotes:

i) The education that you are getting now has some good points, but it has a tremendous disadvantage which is so great that the good things are all weighed down. In the first place it is not a man-making education, it is merely and entirely a negative education. A negative education or any training that is based on negation, is worse than death.

ii) Why, it is nothing but a perfect machine for turning out clerks.

iii) The present system of education is all wrong. The mind is crammed with facts before it knows how to think.

iv) It is one of the evils of your western civilisation that you are after intellectual education alone, and take no care of the heart. It only makes men ten times more selfish, and that will be your destruction.

v) The education that you are receiving now in schools and colleges is only making you a race of dyspeptics. You are working like machines merely, and living a jelly-fish existence.

vi) The vanities of the education of our time are tremendous.

vii) But education has yet to be in the world, and civilisation – civilisation has begun nowhere yet.

Apart from being a great saint, Swamiji is also a great educationist who had envisioned a new India through its transformed education system. He dreamt of an education system which will develop the true spirit and inner soul of an individual.

Sources :–

* The Complete Works of Swami Vivekananda.
* My Idea of Education *compiled by* Dr. Kiran Walia.

Powerful Writing Tools for Aspiring Teachers : Master your Writing Skills

Abdus Safi
[Assistant Professor]

Effective written communication is a cornerstone of the pre-service as well as in-service teaching profession. The web-world is full of effective writing tools that were created specifically to help future educators to enhance their writing abilities and these tools will serve as your guiding companions on this journey. Within this article, a collection of indispensable resources will be unveiled, meticulously curated to enhance your writing prowess. Whether it was crafting compelling lesson plans, providing constructive feedback to students, or articulating your educational philosophy with clarity and eloquence, these tools were tailored to elevate your written expression to new heights.

- ***Microsoft Word*** software provides teachers with various functions and benefits for writing articles and literature reviews. It offers a user-friendly interface, formatting tools, and templates for organizing and structuring content. Features like spell check, grammar correction, and word count aid in enhancing writing quality and efficiency. Microsoft Word simplifies the writing process, improves document presentation, and facilitates effective communication.

- ***Microsoft Power Point*** software enables per-service teachers to create visually appealing lesson presentations, organize content effectively, incorporate multimedia elements, and engage students through interactive features. Power Point helps us to streamline teaching, enhance comprehension, and promote active participation, resulting in improved learning outcomes.

- ***Google Docs***, the on line writing tool offers numerous benefits, including real-time collaboration, easy access across devices, automatic saving, and version history. It promotes teamwork, simplifies document sharing and editing, eliminates the risk of data loss, and allows for efficient collaboration and productivity, making it an essential tool for every individual per-service and in-service teacher and teams alike.

- ***Scrivener*** software offers teachers an array of functions and benefits for writing articles and literature reviews. Its organizational tools aid in structuring research, allowing easy access to references and notes. The split-screen feature facilitates multitasking, while its powerful editing tools enhance clarity and coherence.

- ***Overleaf*** is an online collaborative writing tool for student, teachers and researchers. Its functions include real-time collaboration, version control, and easy access to LaTeX formatting. Pre-service as well as in-service teachers can benefit from efficient document sharing, streamlined feedback and grading processes, improved organization, and enhanced collaboration with students and colleagues, fostering a more productive and engaging learning environment.

- ***Google Keep*** is a versatile app that offers numerous functions and benefits for teachers. It allows to create and organize digital sticky notes, make to-do lists, set reminders, collaborate with students, share resources, and access information from any device. It enhances productivity, organization, and communication, ultimately improving teaching efficiency.

- ***The M-dictionary*** app offers per-service teachers a range of functions and benefits. It offers easy access to a vast collection of terms, translations, and examples in numerous languages. It supports language acquisition, improves vocabulary, and aids in lesson planning. Its straightforward interface and offline functionality guarantee easy use.

- ***English to Bengali dictionary app*** provides teachers with instant translation and meaning of English words in Bengali, helping them effectively communicate with Bengali-speaking students. It enhances vocabulary development, promotes accurate pronunciation, and facilitates a better understanding of texts, ultimately improving teaching and learning experiences.

- ***JabRef*** is a referencing software enables efficient management of references, automates citation formatting, and simplifies bibliography creation. Pre-service teachers as well as researchers can easily organize and search their reference library, collaborate with colleagues, and ensure accurate citations, ultimately saving time and enhancing academic integrity.

- **Zotero** is a powerful software for referencing and citation which is extremely helpful for managing references, generating citations, organizing research materials, collaborating with colleagues, and creating bibliographies. These features save time, ensure accuracy, enhance research productivity, and simplify the process of citing sources.

- ***Ginger*** Software provides teachers with functions like grammar and spell-checking, sentence rephrasing, and text enrichment. It assists in enhancing writing skills, ensuring error-free content, and improving overall language proficiency. You can also be benefited after using Grammerly and the Artificial article rewriter Quillbot but the full functionality and advanced features of both these are available through a paid subscription.

In the modern era, it is crucial for educators to possess technological proficiency, especially regarding writing and note-taking. Numerous tools and apps offered by technology boost creativity, teamwork, and productivity. Teachers who embrace technology are better able to organize and share their notes effectively, expedite the writing process, access extensive grammar and style help, and use digital resources for more effective lesson planning. Teachers that are tech savvy can take full advantage of technology to improve their note-taking and writing processes, which will ultimately increase the effectiveness of their education and student involvement in the digital age.

"Just as clouds are blown away by the wind, so the thirst for material pleasure will be driven away be the utterance of the Lord's name."

– Sri Ramakrishna

"Prayer and meditation, or pilgrimage, or even earning money, all these should be done during the earlier part of one's life."

– Sri Ma Sarada Devi

"We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet."

– Swami Vivekananda

On Coming of the Universal Mother

Subhasis Roy **[Student, B.Ed. 2022-24]**

Under the canopy of heaven throughout that placid day, a mesmeric elation exists, as if a quivering sensation of the real beatification.

The procrastination of the family-members has all but vanished, rather came a zeal of inspirational promptitude.

They are working together with alacrity, as if in a hurry.

What is the meaning of this readiness, reader ? can you guess ? you cannot ? Try to surmise.

The pervasion of the hypnotic fragrance of incense, their ablution in the morning, the canorous sound of coach, the mellifluent resounding of drum, the melodious bell-music and the harmonious continuation of ringing.

Almost a charming symphony with the ecclesiast's sacrosanct hosanas which fill the alter of the adoration. Anointing of the sacred vessel with the touch of divine - vermilion. Then the Mother's icon is embellished with sanctified garland of Tuberose and plenty of Blue bell vine and red china rose, Gardenia and marigold. After the consecretion of oblation, a hymn of the Universal Mother is chanted followed by 'mangalarati'. Eventually a lighting of empyrean fire which symbolizes the cessation of the Cimmerian atmosphere, denotes the termination of this holistic jovial occasion.

Definitely the Mother had come in order to revivify Her sons. Because She also knows that Her presence will give Her sons a perpetual feeling of supramundane delectation.

Reader ! I hope you have assumed the matter. This is the adoration of the Universal Mother, who is the chief vessel of the sumtoal potency of the universe, whose movement of finger would entail the diurnal motion of earth, the cause and consequence of day and night. If she is satisfied with man's veneration, Remember, no power in the Universe, especially the evil power can cope with your progress. An aura of mysticism will engulf you. You will be so fortunate by the volition of the Universal Mother. None but the pure consciousness or Kulakundalini.

Swami Vivekananda's message, still relevant and the eternal source of inspiration for Youth

Debabrata Das
[Guest Lecturer]

Youth is an ideal time for idealism. At no other time in life does a person search for ideals as in Youth. Swami Vivekananda obviously meets the requirments of a youth-ideal and is an ideal for youth any where in the world. This is owing to his extraordinary Physical strength, razor-sharp intelligence, limitless sympathy and love for all suffering creatures, and above all his courage, fighting spirit, leadership, indomitable energy and unsurpassed spiritual knowledge. Swami Vivekananda as a role model of the youth had therefore ignited a spiritual fire across the world, touching to a great extent the hearts of the youth home and abroad. That fire still burns. His ultimate message that instantly electrified the hearts of the Youth in his Physical life span of only 39 years and is still in force to ignite them was : each soul is Potentially divine, and religion is manifestation of divinity already in man. This divinity is manifested when one treats others with love and compassion. He believed at heart India is blessed with spiritual power to lead the world and had his tremendous conviction that India's youth must rise to the occasion and rebuff those outright who would attempt to mislead them. Swamiji boldly said, "be bold and fear not, Arise, awake for your country needs tremendous sacrifice. It is the Youngman that will do it."

To achieve the grand goal, Swami Vivekananda gave the youth a clarion call which still sends ripples over the length and breadth of the country. Calling upon the educated Youths of the country Swamiji exhorted; 'work, work the idea, the plan, my boys, my brave, noble good souls - to the wheel, to the wheel put your shoulders! Stop not to look back for name, or fame or any such nonsense. Throw self over board and work'. And again, 'I am born to organize these young men; ….. . and I want to send them rolling like irresistible waves over India, bringing comfort, morality, religion, education to the doors of the meanest and the most downtrodden. And this I will do or die.'

Swami Vivekananda had a very special message for the Indian Youth of his time who were fighting for their motherland's freedom, and also for those who were fighting against injustice and exploitation in other spheres of life. With biting sarcasm and deep anguish Swamiji said, 'what we have in India are only deep-rooted envy and strong

antipathy against one another, morbid desire to run by hook or by crook the weak, and to lick dog-like the feet of the strong'. He passionately pleaded for firmness of purpose, boldness of enterprise, courage of conviction, strength of mind, deep concern for the sufferings of others and dedication to service. The words of Swamiji are as valid and timely today as they were at the beginning of the last century, perhaps ever more.

Thus, Swami Vivekananda's message has much relevance even in this era to motivate the youths of his beloved motherland. Aptly pertinent to relate in this context that his urge to motivate people to seek higher levels of performance is witnessed through his letter to his direct disciple Swami Shuddhananda in 1897 where he writes, "…..lastly, you must remember I expect more from my children than from my brethren (his brother disciples). I want each one of my children to be a hundred times greater than I could ever be. Everyone of you must be a giant-must, this is my word, obedience, readiness and love for the cause - if you have these three, nothing can hold you back."

Once again, Swami Vivekananda's style of motivational leadership can be envisaged by the following incident in London in 1895. He was supposed to deliver a lecture and was accompanied by Swami Saradananda, one of his eminent Guru brothers. But ultimately when Swamiji's turn came to speak he announced the name of Saradananda. Though surprised at his act, Saradananda delivered an outstanding speech. Swami Vivekananda had felt that Saradananda needed a reinforcement to enhance his self-confidence. With this sort of reinforcement Swamiji always implored people to cultivate faith in themselves for faith in God. He said that as soon as a man loses faith in himself, death comes. So, "believe first in yourself and then in God", said Swamiji. He added that the history of the world is the history of a few men who had faith in themselves. That faith calls out to inner divinity. One can do anything, but one fails only when he does not strive sufficiently to manifest that infinite power already within himself. The greatest religion is to be true to your nature. "Have faith in yourself" and divinity is bound to manifest, Swamiji emphasized more.

Swamiji did not think any man is superior to another. He said only by breaking down the barriers between men and men can usher in the kingdom of heaven on earth. Swamiji said, "after so much of tapasya, austerity I have known that the highest truth is this : He is present in all beings. These are all the manifested forms of Him. There is no other God to seek for. He alone is worshipping God who serves all beings."

Swamiji also said, liberty is the first condition of growth. Just as a man must have liberty to think and speak, so he must have liberty in food, dress and marriage and in every other thing so long as he does not injure others. He said none deserves liberty who is not ready to give liberty. Slaves want power to make slaves. How appropriate

Swamiji's teachings are in today's world when these very ideals are being distorted brazenly by those who still fail to understand him. Absence of equal opportunities and liberty was underlined by Swamiji as major weakness of any country. Privilege, to him, was the bane of human life. 'No Privilege for anyone. Equal chances for all' - should be the ideal. He emphasized that all good comes from faith in equality.

Today's world has widely accepted 'individuality' as essential for a progressive modern society. Swami Vivekananda had put the great emphasis on the 'self' and individuality of a person. But this self-cultivation is not be confused as it often is, with selfishness. This 'self' is the Atman. Swamiji recalls the Upanishad which says, 'I am the Soul', and he adds, 'Let them hear of the Atman - that even the lowest of the low have the Atman within'. It is the consciousness of the existence of Atman which gives one self-confidence and realization that each individual is to be respected. As it's a fact, Vivekananda had learnt from his Master that God's dwelling place was the human body and it was 'the highest temple', Man is the first and last word of the 'Ramakrishna-Vivekananda message and movement. To millions of young men and women in India and the west, who may not be interested in any 'religion', or who may be very sceptical about the existence of God, this offers an entry into a world where they may be at ease in spite of their own doubts and disbeliefs about 'religion', and yet be considered intensely spiritual. Giving this call Swamiji said, ' we reject none, neither theist, nor Pantheist, monist, polytheist, agnostic, nor atheist, the only condition of being a disciple is modelling a character at once the broadest, and the most intense…… . We believe that every being is divine, is God.

So, to remember Swamiji, the very symbol of Youthful dynamism, tireless energy, idealism, patriotism, courage, sacrifice, and humanism, in fine, let us remember on his auspicious 161 years birth anniversary his teachings especially - Man is the highest being in creation because he has the freedom to think. And man can control nature-external and internal by doing work, worship, Phychic control or Philosophy. This is the whole of religion. The divinity of soul, oneness of existence, non-duality of God head and harmony of religion were recurring themes of Swamiji's message. Ultimately, he said what. India needed was not religion, but bread. Let us dedicate ourselves today to spread love, eschew hatred and provide bread to the hungry.

He is truly a man to whom money is only a servant; but, on the other hand, those who do not know how to make a proper use of it, hardly deserve to be called men.

– Sri Ramakrishna

The Sacrifice

Chayan Singha Roy [Student, B.Ed. 2022-24]

[1]

The spectral figure of the train appeared in the horizon. Ready to say her final goodbye to her father, Bijaya was wondering whose life is more wretched hers or her father's. Bijaya's elder brothers haven't come to see off their father obviously; since they don't care about the person who is of no use to them anymore. Tired of continuous dispute over the properties between the brothers the father had decided distributed everything fairly for charity. With nothing for himself in the city of 1946 Natore, he preferred to move to Kashi to leave his remaining life there "Is it just a coincidence or are all coincidences, wishes of Maa Kali ?" Bijaya was wondering, "I was ready to face more tempestuous situations to save my boy, Khoka, but now it seems he is in safer hands, and I also can go back to accept the fate that I have left behind."

The train arrived. Bijaya helped her father with the luggages, and said goodbyes to the two closest people in her life - One is her oldest teacher, her father, who brought her up all by himself after her mother had passed away leaving an infant Bijaya behind with her father and elder brothers; Second one is the newest friend, but seems to have a bond with her since many past births, Khoka, the little kid is probably two years old, Bijaya kissed his forehead before mother uttering the names of mother Kali to shower her last blessing, "If I've done anything good and virtuous in my life, may that go with you", She said.

She, then handed over a box to her father wrapped under her saree.

"What's this, Khooki ?"

"My jewelleries. You'll need these at Kashi."

"But how can I take these ? I could gift you nothing but these jewelleries on your wedding, I have failed to give you anything else in my life, Khooki, don't return these."

"Father, It's a parent's right to gift their children. You'll need these to give Khoka a good life. Take these as my blessings for him, you can't refuse. I couldn't save my child, please save him from everything, Please Father !"

The train whistled. There wasn't much time left. With a long sigh and no tears, Bijaya touched her father's feet for last time. The train started moving.

[2]

Bijaya is staring at the afternoon Sun, and is trying to sum up what she has received from her life in this span of twenty-one years. The boat she is in is sailing towards the palace of Chand-danga village, she is married in.

Seven years ago, she remembers the day she stepped into house as a bride, with a lot of dreams, praying to Kali, for prosperity of her in laws. But today is different. She has lost everything she was afraid to lose. Neither has she seen nor does she know where her husband could be now; he left the house after the dispute with the family over properties. The last candle of hope was her son, Khoka, who was bitten by a snake and was snatched away by death last monsoon. She had no motive anymore to live, as a burden on the shoulders her lost husband's family, until she found her departed son in this suddenly found Kid.

"It was the night of festival, although it was of no difference to me". The festival of Durga Puja was occurring in the household, but nobody expected or even wanted her, in the downstairs. They showed sympathy, that with a little bit annoyance; that wondering what would the poor lady possibly contribute in the ceremony ? Especially, since the unexpected death of her only son, Bijaya was sick in her bed, almost unaware of the festival going on in the house.

Although it was not dawn yet, Bijaya left early to take a bath in the river. Their palace was situated right beside the Padma, and women of the palace had their personal bathing ghat. That is when she discovered the Muslim woman, burnt and lying dead on the wet steps of the staircase. A strong burnt smell filled the fresh air. At the first sight, Vijaya thought that the corpse was carried by the stream; but then she found the little kid, unconscious on the chest of his dead mother.

In the twilight of the dawn She could not see the child clearly, but for a moment, she saw her deceased, forgotten Khoka, and quickly gathered the kid in warmth of her hug. She didn't look back until she reached her bedroom. The Sandhpuja was going on in Thakurdalan downstairs.

She realized that the child may die of high fever if not treated immediately, and without thinking about it's consequences ordered her maid, "Anandi, go and call bhalo-didi, immediately. Tell her that I am not well.

Bhalo didi, the old nurse of this family, came running upstairs thinking it's emergency for Bijaya. But seeing the kid, the old wise lady was suspicious.

"Who is this kid ?", asked she.

"My….my nephew……They have come for puja …… and got high fever since last night".

"Where's his mother ?"

Vijaya's face was paper – white. When she was collecting words to prepare an answer before the piercing eyes of Bholo-didi, Anandi who knew everything, answered cleverly, "gone for bathm gone for a bath". And Bijaya got relieved.

The kid woke up from the feverish slumber, Bijaya tried to feed him, when suddenly Anandi came rushing.

"I heard something shocking."

"Last night, fire broke out in the muslim ward, in which, Bachhiruddin, a fisherman has died. His wife's dead body is found in our ghat, but their two years old son is apparently missing. The Muslim subjects are searching for the kid, suspecting that, the kid might be kidnapped by the royal family." Bijaya didn't waste anytime after learning this news. She knew the folks and her family; the subjects and the royalty. They might fight each other as long as they want to, but in reality, nobody except a mother would care for the orphan child. She ordered her personal servant and maids to arrange her pilgrim and before anyone figured out about the upcoming troubles, she left the house behind with the kid hidden close to her heart. She had no place to go except for her father's house. She knew about the miserable situation of her father. After repeated discussion, the duo decided that it will be best for both the old man and the child is they move out of this scenario and live their lives together leaving all these politics far away. Now Bijaya is going back to the house partly knowing that they won't accept her anymore.

[3]

The boat neared the palace, when the scarlet of evening sky was vanishing under the veil of nightfall. With a beat of wonder, Bijaya noticed the huge palace is standing dark while an old brick monster without any sign of light or movements. When the boat reached the Feery Ghat, she saw a number of shadowy figures and one by one she recognized them the servants of the house and two figures standing staring at her boat were her brother in laws; all dressed in typical Muslim attire.

"Where have you been these days ? Why did you leave without informing anyone in this house?" Asked her elder brother-in-law as she stepped on the steps of the Ghat.

"Stop there. Don't you dare come here. Go back from you're coming. Our gates are closed for you", said another brother, "Forever. Now we can understand, because of you our brother has left us and we don't want you in our family."

Bijaya held her tears back. She knew this is going to happen. Didn't ?

She was wondering why the servants are gathering Luggage's and piling them up in several boards as if a lot of people are moving for really long time ?

"Can you see, we have to leave our ancestral home, only because of you on this pious occasion of Lakshmi Puja," Said the elder one.

Vijay wasn't ready for this blame. her eyes blazed as she spoke, "You always care about why I left and I'll not hide it. I can tolerate everything but shame. On the dawn of Navami, I found a sick child in the bathing ghat lying on her burnt mother. As he was Muslim, I didn't want to risk his life and sent him away in safe hands."

There was long silence. Anyone couldn't believe their ears. How can anyone be so silly ?

"Oh! That was you!", said the younger one in disbelief, "On the festive day you left the house with an untouchable kid! Of course, we had to suffer this curse of the wrathful goddess. You were the reason of all these mischiefs.

"What mischief ?"

"Of course! You will pretend you don't know. But you knew that the Muslims are suspecting our family for the kidnap of the child. Didn't you ? That's why, now I see you ran away with it without letting any of us know."

"Would they take care of my child well if we handed him over to them ? He would still live like of an orphan and that is unbearable to a mother. It is for the good….."

"So, you knew it! The Muslim folks made up their rumours which grew up like an avalanche. Now they believe that we only put fire on the fisherman's house, burnt him, kidnapped his wife and son and captivated the child. They think we have sacrificed the kid to the goddess on Navami and now they are coming to destroy the palace and kill us for revenge."

"Sacrifice ?" She gasped.

"You have sacrificed our whole paternal house and lands, Because of your foolishness. The folks are huge in numbers. We can't fight them. We are leaving the house before they get us."

"Where is mother in law and where are the other people ?"

"Everyone is safe and out of here and we will be too. You don't need to show fake sympathy, you just arrange your own safety. Bijaya stood silent for a while. Looking the vacant palace, which was growing darker, "This is where my dearest son is lying. Today is Laxmi Puja. And I will not leave this house. I have to worship the goddess in this evening for my son and husband."

She climbs the stairs and went in front door. She heard the shout of a servant," Don't go inside, mother, don't".

But she ignored. The house that consumed her dreams and her son, was waiting for the final sacrifice. She has to die here only.

She entered the house and closed the front door and sat in her Pooja room. The yard was greasy with kerosene. She lighted the lamps and started chanting.

"Oh mother, come to me, you have taken everything that I loved - my mother, my son and my family. And today I have nothing but my life to give you. Please take me with you !"

Flames started encircling the house.

School Can be Fun

Partha Bhattacharyya [Student, B.Ed. 2022-24]

School can be fun if you want it to be,
So much more interesting for you and me.
Science, maths, history, so much to choose from,
It keeps us engrossed night and morn !
Why should we be bored ? There is a lot to know
Very interesting things to learn about, so let's go !
Think of those who can't go to school,
They are many in number, not very few.
So all the benefits of learning, we should reap,
As through each stage of life we leap.
Schools can be fun if you want it to be,
So much more interesting for you and to me.

The Last Leaf by O. Henry

Chayan Singha Roy [Student, B.Ed. 2022-24]

[Backdrop : Sometime in November, and Mr. Pneumonia strode out boldly among his victims, and he is already smitten Joanna, nicknamed Johnsy. Johnsy and Sue found their tastes so congenial that they have jointly set up their studio in their apartment.]

Dramatic Personae :–

1. Sue – Young lady from Maine, an aspiring artist.

2. Jhonsy – Young lady from California, an aspiring artist.
Both of them stay together in upper storey of three storey brick house in one colony at Greenwich village, West New Yourk's Washington square.

3. Mr. Behrman – Sexagenarian; a painter; with Michel Angelo's mosses beard curling down from the head of a satyr along body of an imp, who is always to paint a masterpiece, but is yet to begin. He earnsh is little by serving as a model to young artists who could not pay for a professional.

He is stays in the ground floor of the same house of Sue and Johnsy.

4. A doctor.

Scene – 1

[Hallway. Enter doctor from the left, Sue, who had previously been waiting on the right, proceeds to the centre of the stage.]

Sue (in a pensive mood) : How is she, doctor ? Will she recover soon ?

Doctor (raising his eyebrows) : She has one chance in – let us say, ten. And that chance is for her to want to live. This way people have to living up on the side of the undertaker makes the entire pharmacopoeia look silly. You little lady has made up her mind that she is not going to get well. Has she anything on her mind ?

Sue : She - she wanted to paint the bay of Naples someday.

Doctor : Paint! Bosh! Has she anything on her mind worth thinking about twice – a man, for instance?

Sue (surprised and with twang in her voice) : A man ? Is a man worth….. but, no, doctor, there is nothing of that kind.

Doctor : Well, it is the weakness, then. I'll do all that science, so far as it may filter through my efforts, can accomplish. But whenever my patient begins to count the carriages in her funeral procession, I subtract fifty per cent from the caratilee power of medicines. If you will get her to ask one question about the new winter styles in cloak sleeves I will promise you a one in five chance for her, instead of one in ten. (Smiles at Sue, then exits to the right) [Lights off, Curtain]

Scene – 2

[Open curtain. A painted iron bedstead is to be seen at the rear of the stage, and Dutch window-panes in the wall next to it. Jhonsy lies on the bed, scarcely making a ripple under the bedclothes, with her face towards window. An old, ivy vine, gnarled and decayed at the roots, can be seen through the window climbing hall-way up the brick wall at the blank side of the next brick house. (A sad note on violin from background) Spotlight on Sue as she enters the stage from the left, with puffed eyes, swaggering with her drawing board, pen and ink, whistling ragtime. It continues till she drags her things almost centre of the stage; stops whistling thinking that Jhonsy might be asleep. Spotlight now widens and covers the whole stage (note on violin ends). Sue sits before the board and concentrates on illustrations of a short story. Feeble and indistinct voice of Jhonsy is to be heard twice]

Sue : And now, the horseshow ridding trousers appear quite elegant on my hero. Only I need to add a monocle on the figure, and my Idaho cowboy!

Jhonsy (feebly) : …..een!

Sue : What's that? Is my friend not sleeping ! I must see to it. [Goes quickly to the bedside]

Jhonsy : Twelve (a long pause), Eleven (pause), ten (pause), nine (pause) …… eight, seven (almost together).

Sue (Looking at the window) : What is it my dear ?

Johnsy (whispers) : Six. They're falling faster now. Three days ago, there were almost a hundred. It made my headache to count them. But now it's easy. There goes another one. There are only five left now.

Sue (taking to sit at the corner of the bed and caressing Johnsy's forehead with her right palm) : Five what, dear ? Tell your Sudie.

Johnsy (Feebly, in a tried voice, still looking through the window) : Leaves. On the ivy vine. When the last one falls, I must go too. I know that for three days. Didn't the doctor tell you ?

Sue (Straightening her spine) : What nonsense ? What have old ivy leaves to do with your getting well? Don't be a goosy, you naughty girl. And ah! the doctor says that your chances of getting well soon is pretty well! Now try to take some broth and allow Sudie to resume her drawing - so that she can sell it to Mr. Editor and buy port-wine for her sick child and pork chops for her greedy self.

Jhonsy (Still looking out the window) : You needn't get any more will…..there goes another. No, I don't want any broth. The leaves just four. I want to see the last one fall before it gets dark; then I will go too.

Sue (Dolefully) : Johnsy, dear (bending over her) Will you promise me to keep your eyes closed, and not look out of the window until I am done working ? I must hand these drawings in by tomorrow and I need the light to draw the shade.

Johnsy (Turning towards Sue for the fist time) : Couldn't you draw in the another room ?

Sue (Taken aback) : Oh no, Johnsy! I would rather be here by you. Besides I don't want you to keep looking at the silly ivy leaves.

Johnsy : Tell me as soon as you have finished (closes her eyes, but murmurs) because I want to see the last one fall (sad note on violin starts) I am tired of waiting (violin notes grow more sad) …. I am tired of thinking (sad note continues) …. I want to turn lose my hold on everything (note culminate to the most sad pitch) …. and go sailing down (violin not makes a floating sound) …. down …. just like one of these poor tired leaves.

Sue (Controlling her tears) : Try to sleep, my dear (spotlight gets dim) I must call Behrman to be my model for the old hermit miner. (Spotlight reduces more) I'll not be gone a minute. Don't try to move till I come back (Exits by the right. Stage in darkness). [Curtain].

Scene-3

[Curtains open. A dimly lighted room, with all the items of household lying hither and thither in complete disarray. A back canvas on an easel, all covered with dust and dirt, boasts from one corner. Dim spotlight on Behrman, sitting on his daybed and munching some berries kept on a bowl at the bedside table. A knock at the doon.]

Sue (Behind the wings) : Mr. Behrman! Are you in ?

Behrman (Looking to the right) : Yaah, come in!

Sue (Enters from the right) : Do you know Behrman, Johnsy grows incredibly weak these days. She fancies herself to die with the last leaf on the poor ivy vine in our next wall. And I fear that she has herself become light and fragile as a leaf, and may float away when her slight hold upon world grows weaker.

Behrman (With utter contempt) : Vass! Is deer people in de world mit der foolishness to die because leaf's day drop off from a confounded vine ? I haf not heard of such a thing. No, I vill not bose as a model for your fool hermit-dunderhead. Vy do you allow dot silly pushiness to come in der prain of her. Ach, dot poor little Yhonsy!

Sue (Breaking down in tears) : She is very ill and weak. The leaves has left her mind morbid and full of strange fancies…. (Contolling herself) okay, very well, Mr. Behrman, if you do not care to pose for me, you needn't. But all think is that you're a - you're a horrid, old…… a horrid, old flibberti-gibblet.

Behrman (Yelling) : You're just like a woman! Who said I vill not bose ? (Softly) Go on. I come mit you. For half an hour I haf peen trying to say dot I am ready to Bose. Gott! dis is not any blace in which one so goot as Miss Yhonsy shall lie sick. Someday I vill baint a masterpiece, and ve shall all go avay. Gott! yes.

[Both exit by right. Sound of heavy snowfall and rain outside. Lights off. Curtain].

Scene – 4

[Curtains folded. Snowfall and rain has stopped….. Spotlight on Johnsy shedding norming light from behind a green shade drawn before the window. She lays on her bed, staring at the shade before the window. Sue interest from left, yawning.]

Jhonsy : Pull it up Sudie! I want to see.

[Sue goes to the window. Spot light follows her and pans upon the green shade and gets glued to it. Sue removes the green shade and lo! a short blaze on the violin unravels that after the beating rain and fierce gusts of wind that had endured through the livelong night, there yet stood out against the brick wall one ivy leaf. It was the last on the vine. Still dark near its stem, but with its serrated edges tinted with the yellow of dissolution and decay, it hung bravely from a branch source twenty feet above the ground.]

Jhonsy : It is the last one. I thought it would surely fall during the night. I heard the wind. it will fall today, and I shall die at the same time. [Sad note on sitar]

Sue : Dear, dear! Think of me, if you won't think of yourself. What would I do ? [Spotlight fades]

[Next day. Spotlight brightens]

Jhonsy : Raise up the shade Sudie! I want to see.

[Sue raises the shade. The ivy leaf is still there. Sue leaves the stage by the left. Johnsy keeps on looking at the leaf for a long time.]

Johnsy : Sudie!

[She enters the stage from the left, stirring a bowl of piping hot chicken broth and keeps it on the bedside table, and takes her seat on the bed leaning to Johnsy's face.]

Sue : Yes, Jhonsy !

Juhonsy : I have been a bad girl, Sudie! Something has made that last leaf stay there to show me how wicked I was. It is a sin to want to die. You may bring me a little broth now and some milk with a little pot in it and - no bring me a hand mirror first; and then pack some pillow about me, and I will sit up and watch you cook.

[Sue goes out by the left. A brief pause]

Jhonsy : Sudie, someday I hope to paint the Bay of Naples.

[Pause. Light fade gradually, Sue waits in the right corner of the stage, lights suddenly illuminate the entire stage. Enters doctor by the right examines Jhonsy and comes to talk to Sue at the right corner of the stage. Lights on Jhonsy becomes dim. Spotlight focuses on Sue and the Doctor]

Doctor : She is out of danger. You have won, Nutrition and care now, - that's all. And now I must see another case I have down stairs….. Some Mr. Behrman, I suppose. Some kind of artist - I believe. Pneumonia, too. His attack is acute. There is no hope for him. yet he needs to be sent to the hospital today to be made more comfortable. Let's see how he is!

[Exits by the right. Lights off. Draw curtain]

Scene – 5

[Curtains open, Johnsy is seen lying on bed and Sue has put her arms on Jhonsy's neck leaning over the pillows. Flute plays in the background.]

Sue : I have something to tell you, my little white mouse!

Jhonsy : Yes, tell me.

Sue : Mr. Behrman died of pneumonia today in the hospital. He was ill on two days. Two days earlier, the janitor found him on the morning after the dreadful snowfall and the rain, lying in his room downstairs helpless with pain. His shoes and clothes were wet through and icy cold.

Johnsy : Where had he been then ?

Sue : They couldn't imagine where he had been on such a dreadful night. For the first time in their life they found a palette with green and yellow colours mixed on it and some scattered brushes lying on the flower beside him. Later they found a lantern still lighted, and a ladder that had been dragged from its place outside the building.

Jhonsy : But why ? What was he doing there ?

Sue : Didn't you look out of the window, my dear ? Didn't you notice at the last ivy leaf on the wall?

[Spotlight centres on the last ivy leaf outside the window, the rest part of the stage is in darkness.]

Sue (Continues, with tear in eyes) : Didn't you wonder why it never fluttered or moved when the wind blew ? Ah darling! It's Behrman's masterpiece - he painted it there the night the last leaf feel.

[Sad note on the flute and violin]

[Spot light reduces and gets off. Curtain]

Educational Thoughts and Ideas of Dr. A. P. J. Abdul Kalam

Sakander Sk [Student, B.Ed. 2022-24]

Introduction :–

Since many centuries' philosophers, educationists, social reformers, saints are expressing their views on education. Lord Buddha, Mahaveer, Shankarcharya, Swami Vivekananda. Swami Dayanand, Dr. Radhakrishnan, Maharshi Arvind are some of them. Though Dr. A.P.J. Abdul Kalam was renowned scientist, he also expressed his views and thoughts about education. Dr. A.P.J. Abdul Kalam was born on 15th October 1931 in Rameshwaram, Madras. After retiring from the scientific and presidential period, Abdul Kalam started working as an educator and philosopher. For contributions in education. UNO, has announced World Students Day on the occasion of Abdul Kalam's birthday. According to Dr. A.P.J. Abdul Kalam, "education is an endless journey through knowledge and enlightenment". Dr. A.P.J. Abdul Kalam's contribution to India education is undeniable. Dr. A.P.J. Abdul Kalam's educational thoughts and ideas have made a huge difference in Indian education. It was fetched a radical change in the traditional and so-called education system.

Meaning of education :–

According to Dr. Kalam, education means to learn, to earn and develop concern without families, societies and nation for their progress and welfare. He visualizes on integrated system of education, system of learning and system of knowledge. He believes that strength is developed through acquisition of knowledge and preparing for every eventuality.

According to Dr. Kalam, Education cannot be a business product or a system. He says that —

✸ "True education if the acquisition of enlightened feelings and the enlightened power to understand the daily events and to understand the permanent truth by linking citizens, to his environment, human and planet, we live."

✸ "Acquisition of knowledge will make you confident. We should not be afraid of failure. We should learn form every failure and apply the lessons we have learnt.

This will help you succeed. Focusing attention on your task at hand will help remove laziness."

✸ "Education and values imparted in childhood are more important than the education, received in college and university."

✸ "If only the real sense of education is realized by each individual and carried forward in every field of human activity, the world will be so much better place to live in."

✸ "Education as an endless journey through knowledge and enlightenment."

Aims and objectives of education :–

Dr. Kalam recognized the prime necessity for the perfect fusion of quality education and proper guidance to youngsters for social progress. It is instrumental for many educational institutions into Knowledge Society. This transformation has an impact on removing illiteracy in India. Upgrading the education systems in various levels for providing employable education in a country like India, is to develop and enhance potential of our human resources and progressively transform our society into a Knowledge able Society. According to him, the prime aim of education should be to provide quality. Education with value system and provide a creative learning environment at primary level in India. He says that secondary education should provide the confidence and from capabilities in children to start their own small enterprise or go for, higher education's. According to Dr. Kalam, education has a comprehensive aim untill it can be defined in following statements.

These are —

✸ Education system should retain the smiles on the face of our children.

✸ The goal of education is to create an enlightened society.

✸ Focus of the education system should be to train students to become an autonomous learners.

✸ The education system has a tremendous responsibility to transform a child into a leader - The transformation from "What can you do for me to What can I do for you."

✸ The most important part of education is to imbibe the confidence among the students; is the Spirit of 'We can do it'.

✸ Primary education should focus on triggering the creativity of the children.

✸ Education should be imparted with a view to the type of society that we wish to build.

✸ The purpose of teaching is to create nation building capacities in student.

✸ Real education enhances the dignity of a human being and increases his or her self-respect.

✸ Real education is one that makes people think about what they can do for the nation.

Educational philosophy of Dr. A.P.J. Abdul Kalam :–

Dr. A.P.J. Abdul Kalam was a famous academician as well as a famous philosopher. Dr. A.P.J. Abdul Kalam's Educational Philosophy, Education al Thoughts, and Educational Ideas have been able to Influence all Indians and the world.

Educational philosophy of Dr. A.P.J. Abdul Kalam of ideologies :–

Dr. Kalam's philosophy of education involved the essential characteristios of Idealism, Naturalism, Pragmatism and Realism. Like Naturalist, Dr. Kalam emphasizes that real education is possible only through nature and natural propensities. Like Idealist, Kalam insists that, the chief aim of education is to develop to the full, the moral and spiritual nature of child, the essence of which is already present in him. Like pragmatists he lays great stress on the modern scientific and technological based education to achieve material prosperity. The fact is that Dr. Kalam's educational philosophy is a harmonious synthesis of the Indian Ideals and modern beliefs. Beside all these characteristics, Kalam's educational philosophy also has some features of Realism. He is a scientist and strongly attached with technology, as we all know him as 'Missile man". He has firm faith in scientific approach regarding education. Neo-Realism is an invention of modern educationists in the field of science and philosophy. Dr. Kalam is also falls in this particular zone of ideology. This ideology has more importance in the field of philosophy and science than in education. Neo-realism believes that like other rules and procedures, rules and procedures of science are also changeable. They are valid only in certain conditions and circumstances. When those circumstances change, the rules also change. The protagonist of neo-realism emphasizes both the education of arts and sciences.

Dr. Kalam is well known as a great Indian scientist and for his contributions in the field of science and technology. He always provides a scientific base to the philosophy of life and suggests scientific and logical solution to the problems of life. He always presents philosophy of education, based on the scientific ground. According to Kalam, Science is basic and applied to many situations.

Educational philosophy of Dr. A.P.J. Abdul Kalam based naturalism :–

Naturalists believe in full freedom of children to develop and learn by themselves without any restrictions. Kalam loves nature and appreciates its beauty and depth to teach. He believes that nature is the best way to learn. He says that nature is a teacher who never tired or obsolete during progressive teaching-learning process. He also taught from nature as flying seagull on sea shore and got an idea of bout aeroplane and decided his future career at his early childhood age. Dr. Kalam stresses on all the formal and informal educational agencies to get education. He emphasizes equally on both home and school as a place to get education. He gives importance to school education especially at primary level as he believes that education at early stages cast a base for a child's bright and worthy future. He also believes in freedom of child but in a disciplined way.

Educational Philosophy of Dr. Kalam is based on pragmatism :–

The learning process actively takes place in making the students to solve the problems, which helps to broaden their horizons of knowledge and reconstruct their experience in harmony with changing the world. Therefore, teachers should provide learning opportunities to students to create their own learning experiences. They place more emphasis on problem-solving using scientific methods that for gaining organized knowledge Dr. A.P.J. Abdul Kalam here uses the same idea about the curriculum. He emphasizes freedom of expression as a student and believes in sharing experiences. According to him, a child learns better through his own work experience as well as the specific knowledge of the teacher. Thus, by a comparative study of different ideologies, Dr. Kalam's educational philosophy was harmonious, combination of multiple philosophies, and it has a democratic approach to various educational aspects and provides a democratic solution to the problems of a democratic nation.

Educational philosophy of Dr. A.P.J. Abdul Kalam based on realism :–

Dr. A.P.J. Abdul Kalam said, life must be built on great ideals. Further, Dr. A.P.J. Abdul kalam's educational thoughts and ideas are also influenced by idealism. According to Idealism, the goal of education should be to make the person aware of his 'self'

which is the full knowledge about the self or complete development of the underlying energy of man. This goal of self-realization has four levels.

- First is the physical and biological self.
- Second is the social self which determines the social relations and social values.
- The third is the mental self which is self-directed reasoning, and acceptance.
- Fourth is the spiritual self.

Educational Philosophy of Dr. A.P.J. Abdul Kalam based on humanism :–

Humanistic approach is a democratic approach, which recognizes "child" and advocates the providing of a rich environment with a view to have his/her all-round development. This approach makes use of creativity. belongingness, self-development, co-existence, mental health, values etc. It is comparatively new approach to learning. Dr. Kalam's humanistic suggestion —

- A child is capable of learning. Let him learn with love and peace.
- Learning is trial and error process and based on experiences.
- It emphasizes on self-motivation (Autonomous learning) for better learning. It is concerned with the welfare of all human beings and nation.
- It considered the best learning as based on truth, good and beautiful.
- To increase the learner's self-determine what they are learning.
- It believes that learning becomes more effective when it is interesting and need-based.
- It fosters curiosity and innovation.
- It increases learner's reactivity and skillfulness.
- It makes use of creative ideas for the welfare of the society and nation.
- It believes in belongingness such as family, friend, society and nation.

Dr. Kalam also says that education means to have more understanding with life time situations and to handle them with full confidence. Education teaches us to cope with the problems and make us efficient to deal with worldly affairs. According to Dr. Kalam, Education is the only way to fulfill our dreams and accomplish our goal. Education removes the fear of failures by making us knowledgeable and skillful to initiate to be an entrepreneur. Thus, education is the single way to make our nation developed.

Curriculum :–

Dr. A.P.J. Abdul Kalam suggests that —

In the schools and college, teachers should give lectures on moral values at least once in a week for one hour. This may be called as Moral Science Class.

✸ Creativity in the education system can be promoted by reducing the theoretical burden at primary level, progressively increasing it at the secondary level, and finally leading to higher level teaching and creation of self-reliance among students to undertake entrepreneurship and be employment generators rather that employment seekers.

✸ The focus is on gender-sensitive curricula and creating materials for literacy, numeric ability, knowledge, attitude, skills for life and learning process.

✸ Proficiency in science must be enlarged with the reoriented framework of integrating education, research, innovation, and entrepreneurship.

Methods of teaching :–

Dr. A.P.J. Abdul Kalam suggests that ——

✸ Teaching should not only be textbook based but also should be interactive and informal with focus on merit and quality.

✸ Teachers should give theoretical lesson coupled with a live practical example available in nature.

✸ Children should learn through computers and teachers should help the students in this task. Present age is the age of computers and it is really necessary to equip our students with the basic knowledge of computers to keep pace with the outer world. Thus, Dr. Kalam's emphasis on education through computers is very relevant to the present system of education.

Role of the teacher :–

Dr. A.P.J. Abdul Kalam considers teachers are very important and says that they are the backbone of the country. He suggests that ——

✸ Teachers must realize that they are responsible for shaping not just students but igniting youth who are the most powerful resource.

✸ They should treat all the students equally and should not support any differentiation on account of religion, community or language.

✸ The teacher should be such who can elevate the average student to high performance.

✸ Teachers are the child's window to learning so that they should create an environment in which, there is nothing like a good student, average student or poor student.

✸ The teachers are the role models for the students as the noble life practiced by the teacher becomes a beacon light to the students so the young children studying in primary and secondary schools should be blessed with good teacher. A teacher's personality reflects through the student's activities. In modern times, when life is becoming more and more complex and frustration among students is increasing, the teachers have to play their role effectively and guide the students in a positive direction. Thus, Dr. Kalam's has rightly stressed the role of teachers in present education system.

Women Education :–

Dr. A.P.J. Abdul Kalam wants that ——

✸ Women should be empowered through quality education as enlightened women are very important for nation building since their thoughts, the way of working and value system will lead to faster development of a good family, good society and a good nation.

✸ Women education should be emphasized not only on grounds of social justice but also because it accelerates economic and social transformation. Women are to play a very prominent role in making India a developed nation. For making them able to perform their role properly, it's necessary to empower them through education. Thus, Dr. Kalam's emphasis on women education is very relevant in present education system.

Moral Education :–

Dr. A.P.J. Kalam has given much importance to moral education in his educational thoughts. he suggests that —

✸ Moral Education must be provided to the children, right from the school stage so that they have a strong moral value base for the whole life.

✸ Parents and teachers should work for the mission of value inculcation among children in an integrated manner.

✸ The school hours for children are the best time for learning and they need the best of environment and mission-oriented learning with value system. During this stage, they need value-based education in school and at home to become good citizens.

✸ Spirituality must be integrated with education and self-realization should be the focus. Everyone should be aware of his higher self. At present, the education system should emphasize the need for the promotion of values in the aims of education as the younger generation is becoming unaware of the very basic values of life. Thus, Dr. Kalam's thoughts about importance are very relevant to present education system.

Value Education :–

Dr. A.P.J. Abdul Kalam has given much importance to moral education in his educational thoughts. He suggests that ——

✸ See the flower, how generously it distributes perfume and honey. It given to all, gives freely of its love and, when its work is done, it falls away qualities.

✸ From the emperor to the common man, the cultivation of the righteous life is the foundation for all.

✸ The three key societal members who can make a difference are father, mother and teacher.

✸ Conscious is the divine light of the soul that burns within the chambers of our heart.

Technology Enhanced Education :–

Constraints of time and space together with the rapid obsolescence of knowledge in some areas of science and technology have created a huge demand for different courses from different institutions in the distance mode. There is a need for a working digital library system that alone can, in the long run, provide the kind of access required for a knowledge society. Technology Enhanced Learning is a solution, Dr. A.P.J. Abdul Kalam (2005), writes that libraries need to be digitized and the books should be available seamlessly across the universities and distance learning programs for universal access.

Virtual Classrooms :–

Dr. A.P.J. Abdul Kalam (2005) writes that with the growth in information technology, distance education programmes can now have virtual classrooms. The students would not merely be passively listening, there would also be scope for interaction and asking the question by having two-way connectivity between the teacher and the taught. The best teachers can be taken to the students, irrespective of physical distance. Virtual classrooms of the future will have students from many locations taught by a team of geographically distributed instructors through the tele-education delivery system.

Virtual University :–

Dr. A.P.J. Abdul Kalam (2005), writes that there is a need to create a virtual university in India. This can be done through the networking of all the universities of India. This would make it possible for all the networked universities to pool their resources and provide students with a better education than they could manage on their own. Dr. A.P.J. Abdul Kalam suggests the following tasks for Virtual University. The Virtual University will act as a central hub of all networked universities. Record the live transmission of the lecture with interaction details in a databank for easy access by participants for review learning. Digitize all the universities libraries and make them available for seamless access by all the universities. provide lectures, laboratories, learning, and the libraries, all through the internet.

Conclusion :–

Thus, it can be concluded that the essence of Dr. Kalam's personal experience, his life, his educational philosophy and his educational thoughts are treasure, worthy to be possessed, studied deeply and implemented. He is the only president – who has a lot of love for children and feels that the future of India lies in them. Today's young students want the education system to feed and challenge their innovative and creative minds. Educational institutions have to gear up to evolve a curriculum that is sensitive to the social and technological needs of the developed India.

Reference :–

Jeevaraj, E. (2014). The Auto / Biographies of A P J Abdul Kalam. Retrieved from : http://hdl.handle.net/10603/48808

Rupainwar, A. (n.d). Educational Thoughts and Ideas of A P J Abdul Kalam, An analytical study. Retrieved from : http://hdl.handle.net/10603/1114131

Lal, M. (2011). Educational Thoughts of Dr. A.P.J. Abdul Kalam and Its Social relevance. *Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education.* Vol.2, Issue: 1/July. Pp: 1-7. Retrieved from: http://ignited.in/I/a/4723

Jaswal, S. (2022). Evolving Nationhood : A Study of the Select Writings of A.P.J. Abdul Kalam. Retrieved from: http://hdl.handle.net/10603/365276

Occupational Shifting : Land Use and Land Cover Change of South 24 Parganas, West Bengal

Biplab Sardar [Student, B.Ed. 2022-24]

Introduction :–

"In every progressive economy there has been a steady shift of employment and investment from the essential primary activities to secondary activities of all kinds and to a still greater extent into tertiary production'' (Sourav Das, 2013). "The growth in various occupations has its own significance for economic development. Occupations are the activities by which people secure their livelihood" (Desai 1971). In this study, it is focused on the current status of Occupational shifting how to change land use and landcover on South 24 parganas. Analysis of the change between 1991, 2001, 2011 data helps us tried to establish a general Outlook on Occupational shifting of South 24 parganas, West Bengal.

Location of Study Area :–

The location map of study area is South 24 Parganas District, West Bengal, India. The latitudinal extension of the survey area is 21039'28" N, 88019'29"E. Its headquarter is Alipore. It extends from the metropolitan city of Kolkata to the estuary of the Bay of Bengal.

Sundarbans is one of the most renowned tourist spot of South 24-Parganas. In 1987 UNESCO announced Sundarbans as WORLD HERITAGE SITE.

–: Land use and Land cover Change of South 24-Parganas :–

Land use and Land cover 1991 :-

From the land use and land cover map of South 24-Parganas. 1991, we can know the various land use pattern of this district. The southern part of the map was showing dance vegetation cover which denotes the Indian part of the world famous SUNDARBAN MANGROVE FOREST. Maximum portion of Kultali and Gosaba was covered by this mangrove forest. Good amount of scatter vegetation also found in the other blocks. The build up area was mostly concentrated in the Falta, Bishnupur-1 and Mograhat-1 block. In other blocks, the settlement was well distributed and some settlement found near the river or natural levees. Agricultural land was seen all over the South 24-Parganas, without the Sundarbans. Fisheries can't see at a notable rate, slide Inland fisheries can found in Canning 1 & 2, Bhangar 1 & 2 and Budge Budge-1 blocks.

Near about 49% was covered by dense mangrove forest and scattered vegetation (total area under this type of land cover is 3980.2341 sq. km). Though it is falling under

the Ganges deltaic plain Ganges and its various tributaries flows on the region. So, a huge amount of area was covered with these rivers and several water bodies, 13% approximately. Sand bars, point bars covered 1% area of total study area. Total 2304.6894 sq.km land was used for agricultural purposes and 146.0907 sp.km area are used for pisciculture in that time. Settlements, buildings (School, College, Hospital, Office etc.) and others build up areas like road and area under various construction take only 4% land in the South 24-parganas.

Land use and Land cover 2001 :–

The land use and land cover map of South 24-parganas, 2001 (figure) showing the total amount of area under different land use and land cover. From this map, we can see that very dense settlement at the upper portion of the study area, due to the locating near the KOLKATA metropolitan city. Scatter vegetation found in a very low rate; vegetation cover relatively fair in BHANGAR 1& 2, BARIPUR, JAYNAGAR blocks. Trees were cut down due to increase agricultural land. The maximum area of South 24 parganas is used as cultivated land (2526.4863 sq.km). Besides forest and scattered vegetation was the second highest land cover in this area with the value of 2442.4947 sq.km area (33%). This forest cover is the SUNDARBANS mangrove forest.

The forest area was highly decreased in only 10 years' time span. These changes are noticeable from the LULC MAP of 1991 & 2001. Water bodies covered 14% area of total study area. Total 240.7806 sq.km area is used for inland pisciculture. The build up area (mainly settlements) takes only 12% land in the South 24-parganas.

Land use and Land cover 2011

From the land use and land cover map of South 24-parganas, 2011. We observed that the build up area increased heavily all over the district. it caused the vanishing of vegetation cover from the locality; some part of Sundarbans also converted in agricultural land and settlement. Inland fishing has been increasing rapidly. Most of the fisheries can found in the CANNING 1 & 2, BHANGAN-2, Mandir bazar block and little amount of fishing ground seen in the Mathurapur-2, Jaynagar-2, and some part of northern blocks of South-24.

Near about 34% land was used in agriculture which was the maximum share of land in the study area. 2094.6483 sq.km area covered by dense mangrove forest and scattered vegetation (28%). Approximately 13% area covered by various water bodies and rivers. Sand bars, point bars took place 5% area of total study area. Total 570.5 sq.km area is used for pisciculture in that time, 2011. Settlements and others build up areas like roads, office, school, etc. take 13% land in the South 24-parganas.

Land use and Land cover change :–

We can see that the vegetation cover decreases rapidly from 1991 to 2001. The decreasing rate is 12.66% where, in 2001 to 2011, the Decreasing rate relatively low than

the past 10 years. it would be the cause of the different awareness programme to protect forested land due to INDIAN NATIONAL FOREST POLICY, 1998. Change in the area of water bodies in both 2 decade is nominal. Amount of Sand covered area or fallow land increased from 1991 to 2011; though the increasing rate is low in 2001-10 (0.29%). 2.37% cultivated land increased in 1991-2001. Then the cultivated land decreased 0.92% in 2001-11; It's happened due to the increasing pattern of pisciculture. The area under pisciculture increased 3.5% in this time period. The buildup area increased with the high growth rate of population and urbanization.

From the above discussion, we understand that the area under forest cover have been reducing; it may be natural or man-made but it arrives as a serious tension for environment. In the time period 1991 to 2021, area under river and water have decreased, besides the area under sand bars, point bars are increased. It happens due to more sedimentation or construction purpose. Area under Agricultural land, Fishery and settlement have increased in this time period.

Conclusion :–

The area under forest cover have been reducing; it may be natural or man-made but it arrive as a serious tension for environment. In the time period 1991 to 2011, the area under sand bars, point bars are increased. It happens due to more sedimentation or construction purpose. Area under Fishary and settlement in creased in this time period. In the time period of 1991 to 2001, cultivators of 28 blocks shifted their occupation to another. Agricultural labours of 26 blocks changed their profession. Besides, some people of 23 blocks started their occupation as household industrial workers and several people of all blocks join with other occasions. We can understand that the inland fisheries have improved in Canning-2, Jaynagar-2, Kulpi and Canning-1 blocks because huge amount of people were engaged with this profession at the starting of 21st century. After 2010-11 the engagement of people with this profession has started to be decrease.

Reference :–

Bannerjee, H., & Biswas, S. K. (2019). Occupational Changes among Island's Tribals & their socioeconomic status. 13.

Bardhan, B (n.d.). District Survey Report. 87.

Bhattacharjee, I., Roy, P. S., Pal, P., Das, & Ghosh, S. (2017). Economics of Fish Production at Kalna and Its Adjacent Areas, Burdwan District, West Bengal, India. Indian Journal of Biology, 4(1), 7.

District Statistical Handbook. South 24-Parganas. 2009.pdf.(n.d.).

https://censusindia.gov.in/

Bad habits of Youth ruining future of India

Faisal Imam [Student, B.Ed. 2022-24]

Today, India is the second most populated country in the world with more than 50% of its population below the age of 25 and more than 65% below the age of 35. In 2020, the average age of an Indian is 29 years, compared to 37 for China and 48 for Japan.

India has the edge of the demographic dividend. They have the power to change the nation. Young mind will be fresher and more innovative which helps in the progress of the country. Youth is the potential resource of any country that has the power to make the future of the nation.

Indian history is full of youth icons that are examples of the youth power in a country and also a great source of inspiration**.** We can take the example of Swami Vivekananda, a youth icon. He taught us the values of life, Similarly Bhagat Sing and many other freedom fighters who sacrificed their lives for the freedom of our motherland.

Knowledge and unity speak a lot rather than experience. This knowledge and unity are only present in the hands of the youth.

They have the power to change the units individually in the various ethnic groups. The youths are very energetic and enthusiastic. They have the ability to learn and adapt to the environment.

Our youth can bring social reform and can improve the condition of society as well as they eventually determine the country's moral, social and political encouragement.

Today's young generation is more creative, hardworking and aware of their future. They are working to achieve their goal and to contribute to their nation.

As we know, India has the biggest manpower. When our manpower meets at the scale then it will be the great revolution of India. It would be the second industrialization of India.

youth age is the part of life when a person is filled with energy, fresh ideas, anger and motivation. Youth is the age when we want everything and have curiosity of knowing everything in this age. Courage is more in that age and fear is less. Enjoy in taking risks and doing things better than what people have asked to stop doing. It has been observed that the youth of a country driving force towards the success, however, if these youth pick up the wrong path, may hamper the growth of the country significantly. There are lot of countries around the world that are suffering as their local youth picked up the wrong path of terrorism, drug abuse, hacking and different other kinds of antisocial stuff. Also, drug abuse is raising among young people which also derived them towards crime.

CAUSE

Peer Pressure :-

Youth associates with different types of people otherwise known as friends, thought the pressure from these friends, a child tends to have a taste of these drugs and once this is done, they continue to take it and get addicted to it in the long run.

Depression :-

Another primary cause of drug abuse is depression. When certain things happen to someone that are considered very sad and disheartening, the person starts thinking of the best way to become happy once more; hence the use of hard drugs comes in. This later on turns into a habit, hence drug abuse. Another major cause of drug abuse is said to be the rate of unemployment among the youth.

Youth people's brains are growing and developing until they are in their mid 20's. When young can interface within development processes occurring in the brain, they start taking drugs, alcohols and indulge themselves in bad habits which will affect their decision-making capability. And when they continue in these habits, they become addicted in later life. There are a lot of reasons like increasing unemployment, poor political set up of a nation and poor education facilities in a nation that have been unable to keep youth busy in constructive works. The energy of the youth are in the top but when this energy is going over the other side it become destructive and dangerous for the society.

Nearly 18 lakh adults and 4.6 lakh children fall in the badly addicted category according to the AIMS report.

IMPACT

Social Aspect :-

The hard drug makes the taker hyperactive at the point of taking this drug. This makes the taker to behave abnormally, contribute to immoralities such as armed robbery, sexually transmitted diseases, e.g., HIV AIDS and many other societal vices.

Financial Effect :-

The person addicted to drugs tends to spend more money on the purchase of these drugs. This can make the taker to become bankrupt or start searching for money by all means. This will eventually increase the problem of the taker.

Health Effect :-

It makes the taker become unstable. The taker tends to go mad and starts behaving abnormally. It infiltrates a lot of diseases into the system of the taker and can eventually lead to his death.

Support youth and gave bright future of our country :-

If we want to ensure a bright future for our country, we first need to support, strength and empower our youth. It is not necessary to just impart them knowledge written in books, but it is very important to provide the right kind of education which make them scientific, logical, open minded, self respecting, responsible and honest. Our nation needs to resolve most of our problems. Currently India is facing a lot of challenges and the youth are capable of solving them. The role of the youth in the nation building is crucial. They are problem solvers, having a positive influence on the other young people and the nation and are extremely ambitious. They have the ability to create an identity for themselves and move the nation forward.

India will be successful and progressive only if youth are equipped with skills and knowledge. Though the government is coming up with a lot of technical institutions, a lot of schemes in the field of academic in our country, which are proving to be of great benefit.

The entire world facing the menace of drug addiction which has a devastating impact on the addict, individual, family and large section of society. That's why The MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT "SHRI THAWAARCHAND GEHLOT" launched the website for the NASA MUKT BHARAT ABHIYAAN (NMBA) on the occasion of International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking on *"26th June 2021"* which is observed worldwide to strengthen action and cooperation in achieving goal of a sustainable world free of substance abuse.

Conclusion :-

On the whole the conclusion is that we come together and join hands and give a successful future to India by showing a youth power.

Present Governing Body of the College

1.	**Hon'ble Mr. Justice Pinaki Chandra Ghose**	Retd. *Judge*, Supreme Court (Former *Lokpal* of India)	***President*** of the Governing Body
2.	**Swami Jayananda**	*Secretary* of Ramakrishna Mission Boys' Home, Rahara	***Secretary*** of the Governing Body
3.	**Swami Nirishananda**	*Principal (Actg.)* of Ramakrishna Mission Brahmananda College of Education, Rahara	***Asst. Secretary & Ex-Officio*** of the Governing Body
4.	**Swami Kaivalyananda**	*Asst. Secretary* of Ramakrishna Mission Boys' Home, Rahara	***Member*** of the Governing Body
5.	**Swami Kamalasthananda**	*Principal* of Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, Rahara	***Member*** of the Governing Body
6.	**Swami Muralidharananda**	*Headmaster* of Ramakrishna Mission Boys' Home High School, Rahara	***Member*** of the Governing Body
7.	**Swami Vedanuragananda**	*Controller of Examinations* of Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, Rahara	***Member*** of the Governing Body
8.	**Government Nominee (Yet to come)**	.....	***Member*** of the Governing Body (Government Representative)
9.	**Dr. Subir Nag**	*Principal* of Satyapriya Roy College of Education, Salt Lake, Kolkata-700064	***Member*** of the Governing Body (University Representative)
10.	**Dr. Prosenjit Mandal**	*Assistant Professor* of Ramakrishna Mission Brahmananda College of Education, Rahara	***Member*** of the Governing Body (Teachers' Representative)

Our Faculties

HOI :

Swami Nirishananda	**Principal (Actg.)**

TEACHERS :

Dr. Kousik Chattopadhyay	M.A. (Bengali), P.G.B.T., M.Ed., Ph.D. **- Associate Professor**
Dr. Malayendu Dinda	M.A. (English), D.E.L.T., P.G.C.T.E. & P.G.D.T.E., M.Ed., M.Phil., Ph.D. **- Associate Professor**
Dr. Sanjoy Mitra	M.P.Ed., Ph.D., D.N.H.E., D.Y.E. **- Assistant Professor (Stage-II)**
Dr. Prosenjit Mandal	M.Sc. (Zoology), M.A. (Education), M.Ed., M.Phil. (Education), Ph.D. - **Assistant Professor**
Dr. Subrata Biswas	M.Sc. (Physics), P.G.D.G.P.C. & F.T., P.G.D.H.R. & D.E., M.A. (Education), M.Ed., Ph.D. **- Assistant Professor**
Prof. Miltan Biswas	M.Sc. (Geography), Certificate Course in Remote Sensing & GIS, M.Ed., M. Phil. (Geography) **- Assistant Professor**
Prof. Abdus Safi	M.Sc. (Mathematics), M.Ed. - **Assistant Professor**
Dr. Samrat Bisai	M.A. (English), M.Ed., Ph.D. - **Assistant Professor**
Prof. Tusher Kanti Halder	M.A. (English), M.A. (Education), M.Ed., P.G.D.G.P.C. & F.T. - **Assistant Professor**
Prof. Manorajan Pal	M.A. (History), M.Ed., P.G.D.G.C. **- State Aided College Teacher (SACT-II)**

LIBRARY :

Sri Tapas Biswas	M.SC. (Zoology), M.L.I.S., B.T. - **Librarian**

OFFICE :

Sri Abhishek Samanta	M.Sc. (Mathematics) **- Accountant**
Sri Suvojit Chakraborty	B.Com. (Hons.) **- Clerk**
Sri Sanjay Gharai	**Group-D Staff**

HOSTEL (non-teaching staff) :

Sri Ramesh Chowdhury

Sri Bijoy Krishna Mandal

List of B.Ed. Students for the Session : 2022-24

Name : Samiron Porel
Date of Birth: 11/10/1998
Method Paper : Education
Add : VILL. Alipur
P.O. Bhastara, **P.S.** Gurap
District: Hoogly,
Pin: 712303
Email: samironporel2016@gmail.com
Contact:8609080188**; Blood Gr.:** O^+

Name: Subhasis Roy
Date of Birth: 02/10/1991
Method Paper: English
Add: Village & P.O. - Chuadanga,
P.S. Khanakul, Subdivision: Arambag,
District: Hoogly
Pin: 712617
Email: shatosurya.2@gmail.com
Contact: 8016631527**; Blood Gr.:** A^+

Name : Sanjay Singha
Date of Birth : 20/11/1998
Method Paper : History
Method Paper: History
Add : 34 Bagmari road natun pally
District: Kolkata
Pin: 700054
Email:sanjaysingha.20n99@gmail.com
Contact: 9875373020
Blood Gr.: B^+

Name: Bikash Samanta
Date of Birth: 28/04/1997
Method Paper: Mathematics
Add: Shahid Matangini Block, Tamluk
District: East Midnapore
Pin: 721137
Email: me.bikashsamanta123@gmail.com
Contact: 8695332535

Name: Dipankar Barman
Date of Birth: 10/02/2001
Method Paper: Geography
Add: Vill-Pradhan Para, P.O.-
Salkumar Hat, P.S.-Alipurduar
District: Alipurduar**;**
Pin:736204
Email: barmandipankar7407@gmail.com
Contact:7407409057**; Blood Gr.:** A^+

Name: Sourav Ghosh Hazra
Date of Birth: 14/07/1998
Method Paper: Life Science
Add: Sewli, Sewli Telenipara,
Barrackpore
District: North 24 Parganas
Pin: 700121
Email: info.sourav1998@gmail.com
Contact: 8617779311**; Blood Gr.:** B+

Name: Sanjay Bera
Date of Birth: 25/12/2001
Method Paper: Mathematics
Add: Vill-Mamudpur, P.O.-Taki
Mamudpur, P.S.-Hingalganj
District: North 24 Parganas
Pin: 743435
Email: beras2483@gmail.com
Contact: 8167428973 **; Blood Gr.:** B^+

Name: Biplab Sardar
Date of Birth: 06/03/1999
Method Paper: Geography
Add: VILL- Kalugachhi.
P.O. -Chandibari. P. S - jibontala.
Block- canning 2
District: South 24 PGS
Pin: 743502
Email: biplabsardar629522@gmail.com
Contact: 6295227607**; Blood Gr.-** O^+

Name: Chandan Barik
Date of Birth: 08/09/1997
Method Paper: Education
Add: Vill+P.O.- Mrinal Nagar
P.S - Dholahat
District: South 24 Parganas
Pin:743347
Email: barikchandan2016@gmail.com
Contact: 8371049768
Blood Gr.-AB+

Name: Bikash Dhara
Date of Birth: 01/08/1999
Method Paper: History
Add: Vill-Laoda, P.O.-Daspur,
P.S.- Daspur
District: Paschim Medinipur **;**
Pin: 721211
Email: bikashdhara3587@gmail.com
Contact: 8158920624/7407814385
Blood Gr.:O+

List of B.Ed. Students for the Session : 2022-24

Name: Snehasish Sarkar
Date of Birth: 20/11/1999
Method Paper: Mathematics
Add: Vill- Uttar Majidkhana,
P.O.- Tatpara,P.S.- Samuktala
District: Alipurduar
Pin:736208
Email: snehasishsarkar057@gmail.com
Contact: 6296277607 **; Blood Gr.:** AB+

Name: Abhim Mondal
Date of Birth: 24/05/1998
Method Paper: Geography
Add: 115 Trinath colony,
P.O. - Bediapara; P.S.- Dumdum
District: North 24 PGS
Pin:700077
Email: abhimmondal007@gmail.com
Contact: 8697246414 **; Blood Gr.:** AB+

Name: Sourav Halder
Date of Birth: 04.06.1999
Method Paper: History
Add: Babanpur Mathpara, Palta,
PO: Bengal Enamel
District: : North 24 PGS**;**
Pin:743122
Email: haldersourav687@gmail.com
Contact: 7278564323 **Blood Gr. :** B+

Name: Subrata Jele
Date of Birth: 23/04/1998
Method Paper: History
Add: Vill– Pairashi Chaipat;
P.O.: Chaipat,; PS - Daspur
District: Paschim Medinipur
Pin: 721148
Email: subratajele1998@gmail.com
Contact: 7548954785 **Blood Gr.:** B+

Name: Shobhan Paul
Date of Birth: 18/05/1999
Method Paper: Life Science
Add: Vill+P.O.- Laudoha
District: Paschim Bardhaman
Pin:713385
Email: shobhanpaul48@gmail.com
Contact: 8637058891
Blood Gr.: O+

Name: Riju Chatterjee
Date of Birth: 24/12/1996
Method Paper: Mathematics
Add: Sukantanagar,
Kalyan nagar Street,
P.O. Pansila, Rahara,Khardaha
District: North 24 PGS
Pin:700112
Email: riju.chatterjee96@gmail.com
Contact: 9064465669 **Blood Gr.:**B+

Name: Nirmal Sadhukhan
Date of Birth: 27/04/2000
Method Paper: History
Add: Vill+ P.O.- Batanal,
P.S- Arambagh
District: Hooghly
Pin:712615
Email: sadhukhannirmal90@gmail.com
Contact: 7478143654**, Blood Gr.:** B+

Name: Bijay Naiya
Date of Birth: 21/10/1997
Method Paper: Life Science
Add: – Gitanjali Sarani ,
Durganagar Station Road,
P.O. –Rabindranagar, P.S.- Dumdum,
District: North 24 PGS**,**
Pin:700065
Email: bantinaiya36@gmail.com
Contact: 8777840277, **Blood Gr.:** B^+

Name: Prasenjit Sardar
Date of Birth: 11/10/1995
Method Paper: Geography
Add: Vill- Natunpara, P.O.- Gopalpur,
P.S.- Haroa
District: North 24 parganas
Pin:743445
Email: prasenjitsardar143@gmail.com
Contact: 7384027305

Name: Sakander Sk
Date of Birth: 05/08/1999
Method Paper: Education
Add: Vill-Kulsuna, P.O. -Bhalyagram,
P.S. - Mongolkote
District: Purba Bardhaman
Pin: 713143
Email: sakandersk17@gmail.com
Contact: 9614111742 **Blood Gr.:** B+

List of B.Ed. Students for the Session : 2022-24

Name: Arnab Basak
Date of Birth: 07/05/2000
Method Paper: English
Add:32 Purbachal Pally
(No. 2 Bangashree Pally), Bhadreswar
District: Hooghly,
Pin: 712221
Email: arnabbasak519@gmail.com
Contact: 8918598438; **Blood Gr.:** A^+

Name: Faisal Imam
Date of Birth: 24.02.1998
Method Paper: English
Add: Pugmil Hazaribagh Jharkhand,
Pin-825301
Email: faisalimam17261@gmail.com
Contact: 9279878277
Blood Gr.: B^+

Name: Vishal Biswas
Date of Birth: 03/02/1999
Method Paper: Mathematics
Add: Village - Thinagar,
P.O.: Pakuahat, P.S. - Bamangola
District: Malda;
Pin:732138
Email: vbelieve3@gmail.com
Contact: 7432899357; **Blood Gr.:** A^+

Name: Rahul Das
Date of Birth: 15/01/2000
Method Paper: Life Sciences
Add: Vill- Pilsoan, P.O.: Bamunara,
P.S - Mongolkot
District: Purba Barddhaman,
Pin:713131
Email: rahuldasakashwb@gmail.com
Contact:8170049301/9775570770
Blood Gr.: AB^+

Name: Koustav Ghosh
Date of Birth: 24/04/2000
Method Paper: Bengali
Add: Near Golap Sangha Club,
Shastriji Road, P.O.-Nabapally,
P.S.- Barasat, **District:** North 24 PGS
Pin: 700126
Email: koustavkumarghosh@gmail.com
Contact: 9163970163; **Blood Gr.:** O+

Name: Somnath Haldar
Date of Birth: 10/02/2000
Method Paper: History
Add: Vill+P.O. -Kripakhali,
P.S.- Kultali
District: South 24 PGS,
Pin: 743504
Email : haldarsomnath200@gmail.com
Contact: 8116261594; **Blood Gr.:** B^+

Name: Tanmay Bar
Date of Birth: 09/06/1996
Method Paper: Education
Add: Vill+ P.O. Ghatihara P.S.- Nazat
District: North 24 PGS,
Pin: 743442
Email: tanmaybar96@gmail.com
Contact: 7602126004
Blood Gr.: A+

Name: Raju Haldar
Date of Birth: 12/06/1999
Method Paper: Geography
Add : Bhulkimari, Khutadaha,
Bamangola
District: Malda, **Pin:** 732138
Email: rajuhaldar026@gmail.com
Contact: 8328743381, **Blood Gr.:** AB+

Name: Jyotirmay Maity
Date of Birth: 26/12/1998
Method Paper: Bengali
Add: VILL- Nandabhanga,
P.O. - Ganeshnagar, P.S.- Kakdwip
District: South 24 pgs. **Pin:** 743357
Email: jyotirmay675@gmail.com
Contact: 9330539637. **Blood Gr.:** O^+

Name: Sanu Mondal
Date of Birth: 27/05/1999
Method Paper: Education
Add: Khardah Jyoti Colony
District: North 24 PGS
Pin: 700118
Email: msanu2723@gmail.com
Contact: 8420213834;
Blood Gr.: B^+

List of B.Ed. Students for the Session : 2022-24

Name: Rakesh Sardar
Date of Birth: 20/09/1997
Method Paper: Geography
Add: VILL- Natunpara,
P.O- Gopalpur, P.S- Haroa,
District: North 24 pgs**. Pin:** 743445
Email: rakeshfff425@gmail.com
Contact: 6294106530**. Blood Gr.:** B+

Name: Hemanta Paramanik
Date of Birth: 03/03/1999
Method Paper: Bengali
Add: Vill+PO- Jujur, P.S. - Joypur
District: Bankura,
Pin: 722138
Email: hemantaparamanik054@gmail.com
Contact: 8509109605
Blood Gr.: A+

Name: Deepjyoti Dey
Date of Birth: 12/10/1998
Method Paper: Bengali
Add: 10/8/2A Bijoygarh, Jadavpur,
District: Kolkata
Pin: 700092
Email: deepjyotidey97@gmail.com
Contact: 8334864691
Blood Gr.: O+

Name - Partha Bhattacharyya
Date of Birth - 11/02/2000
Method paper - English
Add: Arabindapally, **P.O.-** Saradapally
P.S.- Bhadreswar
Dist – Hooghly; **Pin –** 712124,
Email -
parthabhattacharyya77902@gmail.com
Contact- 6290033803 **Blood Gr.:** A+

Name: Subhrakanti Chakraborty
Date of Birth: 24/08/1998
Method Paper: Geography
Add: Hirapur MCT Palli West, near HP Gas Godown, Kali Mandir Road, Burnpur,**District:** Paschim Bardhaman**,**
Pin: 713325
Email: www.subhra1998@gmail.com
Contact: 7029248401**; Blood Gr.:** A+

Name: Souvik Bera
DOB : 24/08/1998
Method Subject : Mathematics
Add : Dewanchak, Gangadharchak, Marishda,
District : Purba Medinipur
PIN : 721444
Email:berasouvik.17math@gmail.com
Contact : 8436606726; **Bood Gr.:** O+

Name: Sourav Samanta
Date of Birth: 15/08/1999
Method Paper: Education
Add: Village - Jaypur, P.O.- Hansury, P.S.- Magrahat
District: South 24 PGS
Pin: 743609
Email: souravmoysamanta@gmail.com
Contact:7318929503; Blood Gr.: B+

Name: Purna Chandra Das
Date of Birth: 12/10/1998
Method Paper: English
Add: Vill- Kiya, P.O. - Bartana, P.S. - Egra,
District: Purba Medinipur
Pin-721429
Email: purnad673@gmail.com
Contact: 6289632389**; Blood Gr.:** O+

Name: Prakash Kr. Paul
Date of Birth: 03/04/1997
Method Paper: Bengali
Add: Vill+ P.O. - Shalidaha,
P.S. Naihati
District: North 24 PGS
Pin: 743145
Email: prakashpaul767@gmil.com
Contact:8910407336**; Blood Gr.:** B+

Name : Nagar Majhi
Date of birth : 25/5/2000
Method Paper : Life Science
Add: Vill- Ratanpur;
P.O – Mougram,
P.S. - Ketugram
Dist -Purba Burdwan, **Pin -**713123
Email - nagarmajhi10@gmail.com
Contact -7319388388; **Blood Gr.:**A+

List of B.Ed. Students for the Session : 2022-24

Name: Palash Mandal
Date of Birth: 10/07/1999
Method- P.Sc. (Chemisitry)
Address - Manoharpur, Ilashpur, Bhagwanpur.
Dist- Purba Medinipur
Pin-721601
Email- rameshelivator@gmail.com
Contact- 8945921920

Name - Chayan Singha Roy
Date of Birth: 27/11/2000
Method Paper- P.Sc. (Chemistry)
Address - 5/4/A, East Chandmari Road, Anandapuri, Barrackpore, P.O.- Nona Chandan Pukur**,**
Dist.- North 24 PGS**, Pin –** 700122
Email - adidevbarman68@gmail.com
Contact.- 9874442531**; Blood Gr.:** B+

Name- Shyam Hemram
Date of Birth:15/03/1998
Method - Bengali
Add: Vill- Kaifulia,
P.O- Baligeria, P.S. - Nayagram,
Dist- Jhargram, **Pin-721125**
Email- shyamhemramcontai@gmail.com
Contact-8001917636 **Blood Gr.:** AB+

Name - Akash Neel Biswas
D.O.B. - 25 / 08 / 1997
Method Paper - History
Address - 3, Baikuntha Ghosh Road, P.O. - Kasba, Kolkata, Pin. – 700042
Email: linux4akash@gmail.com
Contact No. - 9432205913
Blood Group: A+

Name: Anup Panja
Date of Birth: 10/07/1994
Method : English
Add.: Vill+P.O.:Baikunthapur;
P.S: Kultali
Dist: South 24 PGS
Email: anuppnj@gmail.com
Contact:7501417327

Name: Sourav Sarkar
DOB : 09/06/1999
Method: English
Add: Jharkhali no2; Basanti
District : South 24 Parganas
PIN : 743312
Email: souravsarkar0577@gmail.com
Contact : 8900115047
Blood Gr.: B-

Name: Sourav Bhunia
Date of Birth: 5/11/1997
Method paper: Physics
Add.:Vill+P.O. - Jara
Dist: Paschim Medinipur**.**
Pin: 721232
Email : souravlovephysics1997@gmai.com
Contact: 8697374814
Blood Gr.: A+

Name: Prasanna Pal
Date of Birth: 26/01/2002
Method paper: English
Add. : Trishulapatty, Nanoor Chandidas Road, Post Office - Bolpur.
Dist: Birbhum
Pin: 731204
Email : prodyumnapal2008@gmail.com
Contact: 9064701802 **Blood Gr.:** B+

Name: Sachin Das
Date of Birth: 23/01/1997
Method paper: Life Sicence
Add.: Vill- Gopinathpur, P.O. - Telami
Dist: Purba Medinipur**,**
Pin: 721447
Email:naturalselectionsachin123@gmail.com
Contact: 9007855402
Blood Gr.: O+

Name: Sounak Basak
Date of Birth: 10/11/1992
Method paper: Life Sicence
Add.: 22A, Firanfi Danga Road, Post-Mallickpara
Dist : Hooghly,
Pin: 712203
Email : @gmai.com
Contact: 7044755578

RAMAKRISHNA MISSION BRAHMANANDA COLLEGE OF EDUCATION

R.K.MISSION BRAHMANANDA
COLLEGE OF EDUCATION

"চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি — কর্মের, কমল — ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি — জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি — যোগ এবং জাগ্রত কুন্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংস প্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান — যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয় — চিত্রের ইহাই অর্থ।"

— স্বামী বিবেকানন্দ